চিতোর গড়

অরুণকান্তি সাহা

CHITORE GARH

[A Brief History of Chitore Garh]

By : **Arunkanti Saha**

প্রকাশক ঃ

শ্রীপরেশচন্দ্র সাঁতরা
কমল পাব্লিকেশনস্
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ পট ঃ শ্রীঅজয় গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর, ১৯৬০

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী
ভগবতী প্রেস
১৪/১ ছিদাম মুদী লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

শ্রদ্ধেয় শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ডব্লু. বি. সি এস্।

এ্যাডমিনিস্‌ট্রেটিভ্‌ অফিসার,

কলিকাতা পুলিশ ডাইরেক্টোরেট,

লালবাজার হেড কোয়াটারস্‌, লালবাজার,

কলিকাতা

-লেখকের শ্রদ্ধার্ঘ

ভূমিকা

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজস্থান বাংলার মানসলোকে এক রূপকথার রাজ্য। দূর থেকে প্রতিধ্বনির মত শোনা যায় অলোকসামান্যা রূপবতী পদ্মিনীর বেদনাময় জহরব্রতের কাহিনী; বহু যুদ্ধের নায়ক রাণা সঙ্গের স্বদেশরক্ষা প্রচেষ্টার বীরত্বগাথা, ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ প্রয়াস; দুর্জয় ঔরঙ্গজেবের বিধ্বংসী আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজসিংহের বিজয়লাভের উল্লাস। আর তারই সঙ্গে ভেসে আসে জয়দেবের গীতগোবিন্দের ললিত পদাবলীর অনুসরণে রচিত রাণা কুম্ভের টীকা, কৃষ্ণপদারবিন্দে সমর্পিত প্রাণ মীরাবাঈ-এর ভজন গীতির রসপ্রবাহ। রাজস্থানের এইরূপ প্রকল্পের কেন্দ্রভূমি মেবার রাজ্য, আর সেই রাজ্যের বহু উত্থান, পতন, হতাশা, বীর্যবত্তার সাক্ষী মোহময় নগর রাণী চিতোর। উজ্জ্বল কিরণ-রশ্মি বিস্তারী সূর্যলাঞ্ছিত পতাকা শোভিত গর্বোদ্ধত দুর্গশিখর আজ বহু যুগের স্মৃতির চরণগৃহ। স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনী গাম্ভিরীর উপকূলে সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই দুর্গ অতীতের বহু যুগবাহী সভ্যতা, বীরত্ব, স্থাপত্য, দৃঢ়বদ্ধতার এক অবর্ণনীয় কীর্তিশালা। কিংবদন্তি আছে এক রাত্রির কর্মপ্রচেষ্টায় মহাভারত কাহিনীর অগ্রণীবীর দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এক সময় এই দুর্গ চিত্রকোট নামে পরিচিত ছিল; এখানে রাজত্ব করতো ইতিহাস-খ্যাত 'মোরী' বা মৌর্য নামে পরিচিত এক রাজবংশ। মেবারের ইতিকথা বলে গুহিলট বংশের অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্পাদিত্য তার মাতুল 'মোরী'-রাজকে রাজ্যচ্যুত করে চিত্রকোটে আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। সেই অবধি এই চিতোর গুহিলট রাণা বংশের শক্তিকেন্দ্র। বিস্ময়ের কথা এই ইতিহাসের পাতায় এই মহাশক্তিধর, অসংখ্য সামরিক অভিযানের পরিচালক, ইরাক, ইরান, তুরস্ক, খোরাসান বিজয়ী, রূপকথার অধিনায়ক বাপ্পারাওলের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। রহস্যময় এই নায়কের স্মৃতি-বিজড়িত চিতোর কালপ্রবাহের সঙ্গে নানা রূপকর্মে সমৃদ্ধ হয়েছে, বিস্তৃত হয়েছে এর দুর্গের প্রসার, উদ্ধত গৌরবে প্রসারিত হয়েছে এর তোরণ আর শিখর, বিধ্বস্ত হয়েছে বার বার শত্রুর আক্রমণে; অমিতবিক্রমে দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করেছে কিশোর বীর গোরা আর বাদল, খলজী সম্রাট আলাউদ্দীনের লোভজর্জর আক্রমণের বিরুদ্ধে, প্রতিরোধকারীর বীরত্বে অভিভূত অনন্য-কীর্তি মুঘল সম্রাট আকবর কীর্তিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করে সম্মানিত করেছে রাজপুতবীর জয়মল আর পুত্তকে। কত কীর্তি, কত কাহিনী, কত বৈচিত্র্য, কত সৌন্দর্য ও রসপ্রবাহে সমৃদ্ধ এই চিতোর। বহু প্রাচীনকাল থেকে বাংলা এই চিতোরের গৌরব গাথা শুনেছে। সে অনেক দিনের কথা; মরমীয়া

সুফী কবি মালিক মহম্মদ জয়সী পদ্মিনীর কাহিনী অবলম্বনে রচনা করে- ছিলেন এক রূপক-কাব্য 'পদ্মাবত'। হিন্দী ভাষায় লেখা এই কাব্য বাংলায় রূপান্তরিত করে চট্টগ্রামের রাজসভাসদ কবি আলাওল বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। কাব্যদিগন্তে এই পদ্মিনী কাহিনী এক গভীর প্রেরণার উৎস। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রাজপুত মহিমায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত কর্নেল টড্ রাজস্থান কাহিনীকে তাঁর অপূর্ব বর্ণনাচাতুর্যে মহিমান্বিত করে তুললে, তাঁরই অনুপ্রেরণায় বাংলার মানসলোক কিভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল সে ইতিহাস এখনও রচিত হয়নি। এই অনুপ্রেরণারই কবি রঙ্গলাল পদ্মিনী উপন্যাস অবলম্বনে বাঙালী মানসকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সেই রঙ্গলাল কৃত্যের পর থেকে কত লেখকই না এই রাজস্থান কাহিনী, বিশেষ করে মেবার কাহিনী চারণ করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই মেবার কাহিনীর রাজসিংহ উপাখ্যান বঙ্কিমচন্দ্রকে কি বিপুল- ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তা এক বিস্ময়কর ইতিবৃত্ত। কবি জ্যোতিরিন্দ্র নাথ আর স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি অনুপ্রেরণার সঙ্গে মেবার কাহিনী নিয়ে নাট্য রচনা করেছিলেন। আর দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতন নাটকের সেই মহাকাব্য "গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই। আবার তোরা মানুষ হ" সঙ্গীত কিভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাংলাদেশকে অনুপ্রাণিত করেছিল তা আজ এক বিস্মৃত কাহিনী মাত্র।

রাজস্থানের স্মৃতি অনপসরনেয়। ভারত সংস্কৃতি ধারার সংরক্ষণে রাজপুত জাতির বহু যুগ ব্যাপী রক্তক্ষয়ী প্রয়াস, আত্মদান, বীরত্বগাথার সঙ্গে রূপরস, রঙ্গকৌতুক, ধর্মচেতনা ও ভক্তি প্রবাহের সম্মেলন এক অনন্য সাধারণ কীর্তি। আজ রাজস্থান খণ্ডিত ভারতের প্রবহমান সংস্কৃতি ধারার অন্যতম সন্নিবদ্ধ অঙ্গ। যে সংস্কৃতিকে রাজস্থান নানা বিপ্লবের জ্বালাময় অভিজ্ঞতার মধ্যেও সংরক্ষণ করেছে, আজ ইতিহাস এক যুগ সন্ধিক্ষণে উপস্থিত করেছে সেই সংস্কৃতিকে। এই ক্রান্তিকারী মুহূর্তে চিতোর কাহিনী পরিবেশন করে লেখক এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। অত্যন্ত দ্রুততালে রচিত এই কাহিনীতে চিতোরের কেন্দ্রগত বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। রূপময় চিতোর তার ইতিহাস, বীরগাথা, নানা ঐশ্বর্য সম্পদ নিয়ে এই লেখার ভেতর দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। সাধারণ পাঠকের কাছে এই চিতোর কাহিনী এক বিস্মৃত ঐতিহ্যের সম্ভার পৌঁছে দেবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

রাজস্থান বহু বিপর্যয়ের মুখেও ভারতের যে সংস্কৃতি ধারাকে বহু প্রাণের বিনিময়ে একান্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছে সেই মহান সংস্কৃতি সম্বন্ধে লেখকের রচনা যে প্রভূত অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর এই চিতোর কাহিনীকেও তাই আমি স্বাগত জানাচ্ছি।

৫৬ই, কাঁকুলিয়া রোড
কলকাতা-২৯

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

"Archaeological researches have gone to show that the bank of Gambhiri on which the historic fort of Chittor Stands, was the abade of early man in Rajasthan about a lac of years back."

: এই লেখকের :

ডাক

মিথুন মহল

বাড়ী ভাড়া

লগ্ন এলো

গান করছে গুণী

বাংলার রূপকথা

রাজপ্রাসাদের রহস্য

আমার নাম মীরাবাঈ

ডিকেন্স গ্রন্থাবলী (অনুঃ ১ম খণ্ড)

তিন দেশের গল্প (অনুঃ)

অমিতাভ বুদ্ধ

রাজস্থান ভারতের পশ্চিমে। এ-দেশের আরো দুটো নাম আছে। রাজবারা অথবা রাজপুতানা। এই রাজপুতানার চারপাশে অতীতকালের অনেকগুলো বড় বড় জায়গা আছে। যেমন উত্তরে (একটু পূর্বে) যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ। বর্তমানে দিল্লী। দক্ষিণে (একটু পশ্চিমে) শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা। বর্তমানে গুজরাট। আবার ঐ একই দক্ষিণে (একটু পূর্বে) বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী। পশ্চিমে সিন্ধুদেশ। উত্তরে (দিল্লী থেকে ক্রমে উত্তর-পশ্চিমে) কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর, তারপর পঞ্চনদ বা পঞ্জাব। আমাদের আর্য পিতৃপুরুষগণের আদিভূমি। আবার দিল্লী থেকে দক্ষিণ-পূর্বের দিকে যমুনা। তার তীরে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি মথুরা ও বৃন্দাবন।

রাজপুতানা এমন সব ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে। জল, বৃষ্টি এখানে কম। মাটি শুষ্ক। অনেকটা মরুভূমির মত। ফল-শস্য তেমন জন্মায় না। দেশের মধ্যে একটা পর্বত আছে। নাম আরাবল্লী। মোটামুটিভাবে দু' হাজার হাত উঁচু। আরাবল্লীর দক্ষিণে উঁচু একটা খণ্ড পাহাড় আছে। নাম আবু। পাহাড়টি আরাবল্লীর প্রায় দ্বিগুণ। আরাবল্লী পর্বত উদয়পুরের কাছ থেকে উত্তর-পূর্বে প্রায় আজমীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে দু'টি নাম করা নদী আছে। একটি চম্বল ও অপরটি লুনী। চম্বল আরাবল্লী থেকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর-পূর্বে যমুনায় গিয়ে পড়েছে। লুনীও আরাবল্লী থেকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাটের কাছে কচ্ছ সাগরে মিলিত হয়েছে। এর জল লোনা। এখানে সম্বর নামে একটা হ্রদ আছে। অনেকটা জয়পুরের কাছে। এর জলও বড় লোনা। এখানে লবণ প্রস্তুত হয়। এছাড়া দেশের নানা জায়গায় ছোট ছোট পাহাড়ও বর্তমান। আরাবল্লী পর্বতের উত্তর-পশ্চিম ভাগটাই বেশী শুষ্ক। বেশী মরুভূমিময়। পাহাড়ও এ অঞ্চলে বেশী। আরাবল্লীর দক্ষিণ-পূর্বের ভাগ শুষ্ক কম। কিছু জল আছে। জমি উর্বরা। ফল-শস্য মোটামুটি জন্মায়। রাণা-মহারাণাদের রাজ্য এই দিকে।

রাজপুতানার মাটিতে তেমন রস নেই বটে তবে সে অভাব পূরণ করেছে প্রকৃতি। রাজপুত জাতিকে অনেক বড় বড় গুণ দিয়ে। রাজপুতদের মত এমন বড় প্রাণ, বীরের জাতি পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়।

সেকালে আমাদের দেশের সকল লোক মোটামুটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যেমন ব্রাহ্মণ। এঁরা দরিদ্র। কুটিরে থেকে ধর্ম ও বিদ্যা আলোচনা করতেন। লোককে ধর্ম ও নানা বিদ্যা শেখাতেন। যাগ-যজ্ঞ ও পূজা করতেন। সমস্ত লোক এঁদের দেবতার মত মানতো। সমাজের এঁরাই ছিলেন কর্তা। এঁদের ব্যবস্থা অনুসারে সকল শ্রেণীর লোক চলতো। রাণারা বা রাজারাও এঁদের ব্যবস্থামত রাজ্য শাসন করতেন।

ব্রাহ্মণদের নীচেই ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়েরাই রাজা হতেন। রাজ্য শাসন করতেন। যুদ্ধ করে রাজ্য রক্ষা করতেন। প্রাচীন কালে রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

ক্ষত্রিয়ের নীচেই বৈশ্য। এঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন।

সকলের নীচে শূদ্র। শূদ্ররা ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় এঁদের অধীনে চাকর, মজুর প্রভৃতির কাজ করতেন।

ক্ষত্রিয়ের আদর্শ এবং গুণ সবই রাজপুত জাতির মধ্যে দেখা যায়।

বীরের জাতি রাজপুত। প্রকৃতির গুণে আর শিক্ষার গুণে বীরত্বই এঁদের প্রধান জাতীয় ধর্ম। বীরত্বের সঙ্গে আরো কতকগুলো বড় বড় গুণ এঁদের মধ্যে দেখা যেত। যা না থাকলে বীরকে প্রকৃত বীর বলা যায় না। এঁরা দুর্বলের ওপর কখনও অত্যাচার বা উৎপীড়ন করতেন না। যুদ্ধের মধ্যে বড় শত্রুও যদি কখনও দয়া প্রার্থনা করতেন, তবে এঁরা দয়া দেখাতেন। বিপক্ষ কেহ আশ্রয় চাইলে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করতেন। কথা দিয়ে রাজপুত কখনও কথা ফিরিয়ে নিতেন না বা ভাঙতেন না। রাজপুতদের প্রতিজ্ঞা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মতই অটল থাকতো। কেহ কোন অবিশ্বাসের কাজ করলে রাজপুত চিরকাল তা মনে রাখতেন। আবার বিশ্বাসীকে বিশ্বাস করতে কখনও কুণ্ঠা করতেন না। এবং সে বিশ্বাস জীবনে ভাঙতেনও না। নিজের অপমান, স্বজাতির অপমান অথবা স্বদেশের অপমান রাজপুত কখনও সহ্য করতেন না। নিজেদের সম্মানের জন্যে প্রাণ দেওয়া রাজপুতদের একটা খেলার জিনিস ছিল। রাজপুতেরা মেয়েদের বড় সম্মান করতেন। মেয়েদের মানের জন্যে রাজপুতেরা করতে পারেন না এমন কাজ ছিল না। আবার রাজপুত রমণীদের তেজও পুরুষদের চেয়ে কিছু কম ছিল না। মা ভাবতেন ছেলেকে বীর হতেই হবে। বোন ভাবতেন আমার ভাই বীর। স্ত্রী ভাবতেন আমার স্বামী যদি বীর হয় তবেই আমি ভাগ্যবতী। রাজপুত মেয়েদের ধারণা কাপুরুষ স্বামীর স্ত্রী হবার চেয়ে জন্ম জন্ম বিধবা থাকা অনেক ভাল। কন্যা ভাবতেন আমি বীরের কন্যা। তাই আমার গৌরব। যুদ্ধে যাবার সময় মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা সকলেই হাসিমুখে নিজের ছেলে, স্বামী, পিতা সকলকে উৎসাহ দিয়ে বিদায় দিতেন।

নিজেদের মান-ইজ্জত রাখবার জন্যে রাজপুত মেয়েরা যা' করতেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা তুলনাহীন। বিদেশী বা ভিন্নধর্মী মুসলমানদের সঙ্গে রাজপুতদের বেশী যুদ্ধ হ'ত। যখন রাজ্য রক্ষার আর কোন উপায় থাকতো না, তখন রাজপুত রমণীরা আগুনে পুড়ে মরতেন। একে বলা হয় 'জহর ব্রত'।

রাজপুতেরা ক্ষত্রিয়। আমাদের দেশে প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দু'টি প্রধান বংশ ছিল। সূর্য এবং চন্দ্রবংশ। রামায়ণের রামচন্দ্র সূর্যবংশের রাজা ছিলেন। আবার মহাভারতের কৌরব-পাণ্ডবেরা চন্দ্রবংশের। চন্দ্র-বংশেরও আবার দুটি বড় শাখা ছিল। পুরুবংশ এবং যদুবংশ। পুরু-বংশের লোকদের 'পৌরব' এবং যদুবংশের লোকদের 'যাদব' বলতো। কৌরবরা এবং পাণ্ডবরা 'পৌরব' ছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম 'যাদব' ছিলেন।

রাজপুতদের মধ্যে অনেকে প্রাচীন সূর্যবংশের ও চন্দ্রবংশের ক্ষত্রিয় ছিলেন। মেবারের রাণারা নিজেদের সূর্যকুলের রামচন্দ্রের বংশধর বলে গৌরব করতেন। মারবারের রাঠোর রাও সূর্যবংশীয় ছিলেন। এই সূর্য এবং চন্দ্রকুল ছাড়াও রাজপুতদের মধ্যে আরো চারটি শাখায় বিভক্ত একটি বড় কুল ছিল। তার নাম 'অগ্নিকুল'। চারজন 'অগ্নিকুমার' থেকে 'অগ্নি-কুলের' চারটি শাখার উদ্ভব। অনেক রাজপুতদের এমনই বিশ্বাস। এই 'অগ্নিকুমার' কারা এবং কেমন করে হলেন, এ-বিষয়ে একটা সুন্দর গল্প আছে।

বৌদ্ধ ধর্ম যখন এদেশে বিস্তার লাভ করতে থাকে, তখন বৌদ্ধধর্মের মতই আর এক ধর্মও এদেশে বড় হয়ে উঠতে থাকে। তার নাম জৈনধর্ম। কলকাতায় যে পরেশনাথের মন্দির আছে সেটা জৈনধর্মের একজন আদিগুরু জিন পার্শ্বনাথের নাম অনুসারে প্রতিষ্ঠিত। ছোটনাগপুর অঞ্চলে পরেশ-নাথ পর্বত আছে। সেখানেও পরেশনাথের মন্দির বর্তমান। এই পর্বত জৈনদের একটি বড় তীর্থস্থান।

এক সময় রাজপুতানায় জৈনধর্ম ও জৈন সমাজ বড় প্রবল হয়ে ওঠে। আবার এদিকে ভারতবর্ষে বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাতেও বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সমাজের প্রাধান্য দেখা যায়।

অতীতে গুজরাট-রাজপুতানা প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুধর্মের সঙ্গে জৈন-ধর্মের বড় রকমের একটা বিরোধ ঘটে। তখন ব্রাহ্মণদের ধারণা হল যে, বড় বড় কয়েকজন বীর হিন্দুরাজা না হলে হিন্দুধর্ম ও সমাজ রক্ষা করা যাবে না। তখন তাঁরা আবু পর্বতের ওপর যজ্ঞ করতে আরম্ভ করলেন। যজ্ঞের আগুন থেকে একে একে পুরিহর, চালুক, প্রসার ও চোহান নামে এই চারজন বীর অস্ত্র হাতে নিয়ে উঠে এলেন। প্রথম তিনজন তেমন বীর ছিলেন না।

চতুর্থজন জৈনদের দমন করে ব্রাহ্মণদের হিন্দুধর্ম ও সমাজ রক্ষা করেন। কথিত আছে এই চারজনই 'অগ্নিকুমার'। এঁদের চারজনের বংশ থেকেই 'অগ্নিকুলের' চারটি শাখার উদ্ভব।

এ-গল্প কথিত গল্প। রাজপুত জাতির অনেকেই এ-গল্প বিশ্বাস করেন। এ-গল্পের সত্য-মিথ্যা অজ্ঞাত।

এখন সত্য-সত্যই যজ্ঞের কুণ্ড থেকে চারজন বীর উঠে এলেন, এমন প্রবাদ মোটামুটিভাবে অবিশ্বাস্য। তবে এ-গল্পের মূলে সত্য এমন হতে পারে যে, ব্রাহ্মণেরা চারজন বীরপুরুষকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে যুদ্ধে পাঠান এবং তাঁরা জয়ী হয়ে ফিরে আসেন। সেই কারণেই এই বংশের উত্তর পুরুষরা 'অগ্নিকুল' নামে পরিচিত।

অতি প্রাচীনকালে রাজপুতানা অঞ্চলে রাজপুত নামে কোন বড় ক্ষত্রিয় জাতি বাস করতেন এমন ইতিহাস তৎকালীন কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। অনুসন্ধান করে দেখা যাচ্ছে যে, একহাজার বছরের কিছু আগে মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসতে আরম্ভ করেন। সেই সময় এবং তার কিছু পূর্ব থেকে রাজপুতদের কথা শোনা যায়। তখন থেকেই এ-কথা সর্বত্র প্রচারিত যে, কেবল রাজপুতানায় নয় ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগের সব স্থানেই রাজপুত রাজারা রাজত্ব করতেন। এঁদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধ লেগেই থাকতো। মুসলমানেরা এই সময় ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতাপ ও প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং মোটামুটিভাবে উত্তর ভারতের প্রায় সব রাজ্যই অধিকার করে নেয়। কিন্তু রাজপুতানায় রাজপুত রাজারাই বরাবর রাজত্ব করে গিয়েছেন। এখানে মুশলমানদের সঙ্গে রাজপুতদের মুখোমুখি হতে হয় আরো অনেক পরে।

এক সময় রাজপুতানায় অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য ছিল। তারমধ্যে মেবার, মারবার বা যোধপুর, অম্বর বা জয়পুর, যশলমীর, হীরাবতী ও বিকানীরই প্রধান।

আরাবল্লী পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বে মেবার। কোটা ও বুন্দী নিয়ে হীরাবতী। এ রাজ্য মেবারের উত্তর-পূর্বে। আরাবল্লীর উত্তরে আজমীর। আজমীর থেকে আবার কিছু উত্তরে অম্বর বা জয়পুর। আরাবল্লীর উত্তর-পশ্চিমে মেবারের বিপরীত দিকে মারবার বা যোধপুর। এ সবের উত্তরে মরুদেশের মধ্যে বিকানীর। আর একেবারে পশ্চিমের দিকে সিন্ধু দেশের কাছে যশলমীর রাজ্য। তবে এসব রাজ্যের মধ্যে নামে এবং গৌরবে মেবারই প্রধান। মেবারের রাজাদের বলা হত রাণা ও মহারাণা।

রাজপুতানায় এক সময় এক সম্প্রদায় কবি ছিলেন, যাঁদের বলা হত 'ভাট্ট' 'ভাটু'। এইসব কবিরা রাজপুত বীরদের বীরত্ব-গাঁথা, মহত্ত্বের কথা রচনা

করে গান গেয়ে বেড়াতেন। এইসব গাঁথা থেকেই রাজস্থানের অতীত ইতিহাস এবং রাজপুতদের গৌরব-গাথা জানতে পারা যায়।

রাজপুতদের শ্রেষ্ঠ বীর-কীর্তি 'চিতোর গড়'। 'চিতোর গড়ের' প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পা রাওল। এবারে আমরা 'চিতোর গড়'-এর আলোচনায় আসবো।

* * * * *

পর্বত-বেষ্টিত চিতোর গড়। গাম্ভিরী নদীর তীরে একা নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে এ-গড় দেশমাতৃকার পূজায় নিযুক্ত। এ-গড়ের স্থাপত্যবিদ্যা ও ইতিহাসের ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। এর ঐতিহাসিকতা ভারতবর্ষ ছাড়িয়েও বিস্তৃত। রাজপুতদের বীরত্ব আর দেশপ্রেম আজ উপকথা। এইসব বীর রাজপুত রাণারা চিতোর রক্ষার জন্যে আজীবন যুদ্ধ করে এসেছে। মেবারের স্বাধীনতার জন্যে এরা জীবন দান করেছে। মুঘলদের আক্রমণ এরা বার বার প্রতিহত করেছে। এই সেই পবিত্র স্থান যেখানে সমস্ত রাজপুত ও রাজপুত রমণীরা নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রাণ দিয়েছে। রাজপুত রমণীরা নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে 'জহর' ব্রত পালন করেছে। এই সেই জায়গা যেখানে জন্ম নিয়েছে বীর হামীর, চুন্ডা, রাণাকুম্ভ, রাণা সাঙ্গা, মহারাণা প্রতাপ, ভীমা শা' এবং মহিলাদের মধ্যে পদ্মিনী, করম দেবী, মীরাবাঈ এবং পান্না। ইতিহাসে এরা অমর। এখানকার প্রতিটি ইট ও পাথর এদের বীরত্বে ও বীর্যে উজ্জ্বল।

Dr. Annie Beasant চিতোরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "One of the cities that seem to have been doomed to continual struggle and gateway on her winding ascent is marked with stones that tell how a hero faught and died. She sits on her mountain-top a queen, though discrowned now, and gazes over the wide plains that she has often seen glittering with lance points, quivering under the hoofs of charging squadrons."

ডাঃ এ্যানি বেশান্তের এ-কথা রাজপুত সভ্যতা ও বীরত্বের স্তম্ভ স্বরূপ। হিন্দুরা এখানে এসে পবিত্র গঙ্গার জলের মত এ ধূলি গ্রহণ করে। দর্শকরা চিতোরের দুর্গ দেখেই রাজপুতদের বীরত্বের নমুনা বুঝতে পারে।

চিতোরের দুর্গ, ভূমি থেকে পাহাড়ের 500 ফুট উঁচুতে। সাগরের সমভূমি থেকে ১৮৫০ ফুট। উত্তর থেকে দক্ষিণের আয়তন তিন মাইলেরও বেশী। চওড়া আধ মাইল। ৬৯০ একর জমি জুড়ে আছে। নীচের পরিধি আট

মাইল। এই অবস্থায় চিতোর গড় নিঃসঙ্গ একা দাঁড়িয়ে। দর্শকদের কাছে এ দুর্গ শুধু যুদ্ধ বর্ণনা নয়। অতীত সভ্যতা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য-বিদ্যা ও এক মহান ধর্মের প্রতিমূর্তি।

"Archaeological researches have gone to show that the bank of gambhiri on which the historic fort of chittor stands, was the abode of early man in Rajasthan about a lac of years back."

এই দুর্গ কবে তৈরী হয় বা কে তৈরী করেন, এ-কথা বলা অসম্ভব। কথিত আছে মহাভারতের কালে পাণ্ডবের দ্বিতীয় পুত্র ভীম একরাত্রে এই দুর্গ তৈরী করেন। এই পাহাড়ের এক যোগী ভীমকে ভবিষ্যত-বাণীর প্রমাণ-স্বরূপ একটি পাথর দেন। ভীম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এক রাত্রে এই দুর্গ তৈরী করান। কিন্তু ইতিহাস বলে এটা রাজপুত প্রধান চিত্রাং-এর তৈরী। তিনি তাঁর নামে এ-দুর্গের নাম রাখেন 'চিত্রকোট'। তখনকার দিনে মেবারের মুদ্রাতে এই নাম দেখা যায়। এরপর 734 A. D.-তে এই চিত্রকোট বাপ্পা রাওলের হাতে আসে এবং মেবারের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। এই সময় থেকেই এই দুর্গের ওপর মুশলমানদের আক্রমণ শুরু হয়। অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে আলাউদ্দীন খিলজী এ দুর্গ দখল করেন 1303 A. D.-তে। গুজরাটের বাহাদুর শা' 1534 A. D-তে। এবং সবশেষে আকবর 1567 A. D.-তে। বার বার হাত পাল্টাবার ফলে এখানকার শিল্প-স্থাপত্য সব নষ্ট হয়ে যায়। এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুসলমান রাজাদের রাজত্বকালে এই দুর্গ আবার নতুনভাবে তৈরী করা হয়।

চিতোর গড় থেকে একটা বাঁধানো রাস্তা গাম্ভিরী নদী পার হয়ে ফোর্টের দিকে চলে গেছে। এই গাম্ভিরী সেতু ১৪ শকাব্দ আলাউদ্দীন খিলজীর ছেলে কাইজার খান তৈরী করান। এই সেতুতে দশটা গেট আছে। এখান থেকে আসল দুর্গ ৪ মাইল দূরে। প্রথম গেটের নাম 'পদন পোল'। এখানে একটি বাঘ শিং-এর স্মৃতিস্তম্ভ আছে। বাঘ সিং মহারাণা মুকুলের নাতি। মহারাণা মুকুল গুজরাটের বাহাদুর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। গেট্ পার হয়ে একটা ঝর্ণা আছে। পাশেই বাগান। প্রথম গেট্ থেকে দ্বিতীয় গেটের দূরত্ব 1·050 গজ। দ্বিতীয় গেট্ পার হয়ে জয়মলের স্মৃতিস্তম্ভ। আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে এঁর মৃত্যু হয়। এরপর যতগুলো গেট আছে সবই এক একজন রাণা-মহারাণার নামে।

সাধারণভাবে এই ফোর্টে যাবার দুটো পথ। একটা ধ্বংসাবশেষের দিকে। অপরটি আসল ফোর্টের দিকে। ধ্বংসাবশেষের একদিকে একটা মন্দির আছে। এক সময় রাজারা এ-মন্দির ব্যবহার করতেন। তৈরী 1474

A.D.-তে। এই মন্দির পৃথ্বীরাজের জারজ পুত্র বনবীর তৈরী করেন। পৃথ্বীরাজের ভাই মহারাণা সংগ্রাম সিংহ। তিনিই চিতোর গড়ের শেষ হিন্দু রাণা। তাঁর শৌর্য, বীর্য ও বীরত্ব ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইতিহাসের পাতায় তিনি অমর হয়ে আছেন। তাঁর পুত্রবধূ মীরাবাঈ। যিনি সাধিকা ও সংগীত নিপুণা হয়েও তৎকালীন চিতোরের রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। আজও মীরাবাঈ-এর গান সমস্ত ভারতভূমি প্লাবিত করে রেখেছে। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের বড় ছেলে ভোজ রাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই ফোর্টের গায়েই লাখ ট্রেজারী (Lakh Treasury) আছে। এই লাখ ট্রেজারী তৈরী করতে ন'লাখ টাকা পড়েছিল। সেই কারণেই এই ট্রেজারীর নাম লাখ ট্রেজারী। এই ট্রেজারীতে মেবারের যত ধন-দৌলত গোপনে রাখা হ'ত। এখানে রাণা প্রতাপের মূর্তি আছে। কথিত আছে রাণা ভীমা শা' তাঁর গুরু মহারাণা প্রতাপের নামে এখানে পুজো দিয়ে নিজের মাতৃভূমি রক্ষার জন্যে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। এখন এ-সবের কোন অস্তিত্ব নেই বললেও চলে। এর পাশে জৈন মন্দির। তৈরী 1449 A.D.-তে। তার পাশে রাণা কুম্ভের রাজপ্রাসাদ। এর স্থাপত্য-বিদ্যা অতীব সুন্দর। রাণা কুম্ভ একজন স্বাধীনচেতা সাহসী বীর ও পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং স্থাপত্য-বিদ্যায় অত্যধিক পারদর্শী ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করেছিলেন। এই রাজপ্রাসাদের ভূগর্ভ পথে গোমুখী নদীতে যাবার গোপন রাস্তা ছিল। রাণা কুম্ভ এই গোপন পথে প্রতিদিন স্নানে যেতেন। এই প্রাসাদের পাশেই মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মন্দির। আগেই বলা হয়েছে তিনিই চিতোরের শেষ হিন্দুরাণা। তিনি বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে চিতোর গড়কে বাঁচাতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। এ-মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ২৭টা জৈন মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। সব কটিই মোটামুটিভাবে একাদশ শতাব্দীতে তৈরী। এইসব জৈন মন্দিরের পাশে কুম্ভশ্যাম মন্দির। রাণা কুম্ভ 1448 A.D.-তে এই মন্দির নির্মাণ করেন। তারই পাশে মীরাবাঈ-এর নিজস্ব মন্দির। মীরাবাঈ-এর স্বামী ভোজরাজ এটি তাঁর স্ত্রীর সাধনার জন্যে তৈরী করেন। মীরাবাঈ-এই মন্দিরেই তাঁর কৃষ্ণ বিগ্রহ-টি স্থাপন করে আজীবন (যতদিন তিনি চিতোরে ছিলেন) সাধন-ভজন করেছেন। কৃষ্ণ বিগ্রহটি তিনি তাঁর মন্ত্র গুরু সন্ত রাহিদাসের কাছ থেকে উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন। মীরাবাঈ-এর মন্দিরের পাশেই রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ। তিনি সুলতান মামুদকে পরাজিত করে 1448 A.D.-তে এই জয়স্তম্ভ তৈরী করেন। এর উচ্চতা ১২০ ফুট। আয়তন ৩০ ফুট। এ স্তম্ভের সারা গায়ে হিন্দুদের বীরত্বের ইতিহাস খোদাই করা আছে।

এরপর ঐ রাণা বংশের প্রতিটি পুরুষের এবং তাঁদের রাজত্বের ইতিহাস-সহ একটি করে মন্দির আছে।

চিতোর গড়ের ইতিহাস অনুসন্ধান করে এবং কিছু কিছু নিদর্শন দেখে মনে হয় অনেকদিন আগে এই চিতোর গড়ের বাইরে একটা শহরের অস্তিত্ব ছিল। শহরটির নাম বিদগ্ধ ব্যক্তিগণের মতে 'মাধ্যমিকা'। শোনা যায় এই শহরটি গড়ে তুলেছিলেন একজন গ্রীসদেশীয় লোক। নাম 'শিভিস্'। তিনি গ্রীস থেকে পালিয়ে ভারতে আসেন।

এই 'মাধ্যমিকা' শহরের অস্তিত্ব যেমন জানা গেছে, তেমন কিছু কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের হাতে এসেছে। যা' দেখে কয়েক হাজার বছরের পুরোনো ভারতীয় সভ্যতার কথা জানা সম্ভব হয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, এক সময় এই 'মাধ্যমিকা' শহর অতীব সুন্দর ছিল। এবং এ শহরের অবস্থিতি ছিল চিতোর গড় থেকে অনেক দূরে। একসময় এখানে জৈন, বুদ্ধ এবং হিন্দুদের দেবদেবীর মন্দিরও ছিল বলে অনুমান করা হয়। এখানে 2nd. Century B C -র কিছু মুদ্রা ও মুদ্রণ পাওয়া গেছে। এই মুদ্রা ও মুদ্রণ শুধু রাজস্থানে নয়, সমস্ত দেশের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে। দেখা যাচ্ছে এর কিছু কিছু মুদ্রা ও মুদ্রণ যীশুখৃষ্টেরও আগে।

চিতোর গড়ের অতীত মুদ্রা দেখে মনে হয় অতীতে এই সমতলভূমি ও আরাবল্লী পর্বতে গুবিলটরা রাজত্ব করে গেছে। এখানে কিছু কিছু নিদর্শন আছে যা' গুপ্তযুগেরও আগে।

চিতোরের দুর্গ বীরত্বের প্রতীক। এ-দুর্গ স্মরণ করিয়ে দেবে বীর হামীর, রাণা কুম্ভ, বাপ্পা রাওয়াল, রাণা সাঙ্গা, মহারাণা প্রতাপ আর বীর জয়মলকে। স্মরণ করিয়ে দেবে পদ্মিনী, পান্না, কর্মবতী, তারাবাঈ আর মীরাবাঈকে। রাণা প্রতাপ যখন চিতোর রক্ষার জন্যে আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন চিতোরের ভীমা শা' তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, অর্থ ও নিজের কর্ম দিয়ে চিতোর উদ্ধারের জন্যে রাণা প্রতাপকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সাহায্য পেয়েই তিনি আবার নতুন উদ্যমে আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন।

চিতোরকে এককথায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটা পীঠস্থানও বলা যায়। এখানে জৈন, বুদ্ধ, শিব, শাক্ত ও সূর্যের অনেক মন্দির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। Sir Thomas জাহাঙ্গীরের দরবারে British Ambassador ছিলেন। তিনি চিতোর দেখে বলেছিলেন,

> "Chittor, an ancient city ruined on a hill, but so that it appears a tomb of wanderful magnificance."

অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরাও এই চিতোরকে পবিত্র-ভূমি মনে কোরে এখানে দীর্ঘদিন বাস করে গেছেন। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে বহু লোক এই চিতোর দেখতে এবং সম্মান জানাতে আসে। হিন্দুরা এই চিতোর গড়ের ভূমিকে গঙ্গাজলের মত পবিত্র মনে করে। স্বাধীনচেতা মানুষকে এই চিতোর বীরত্বের উৎসাহ যোগায়। এককথায় এই চিতোরের গুণাগুণ বর্ণনা প্রায় অসম্ভব। মেওয়ারের সমভূমি থেকে এই চিতোর দুর্গ পর্বতের ৫০০ ফুট ওপরে। সমুদ্র থেকে এর উচ্চতা ১৮৫০ ফুট। উত্তর-দক্ষিণ ৩½ মাইল। কেন্দ্র ½ মাইল (পূর্ব-পশ্চিম) কিন্তু ভেতরের আসল আয়তন ৮ মাইল।

Rev. Edward Terry who visited the fort along with Sir Thomas Roe it 1615 A.D. said, "Chitore stood on a high hill and was the main city of an old and big Kingdom. The circumference of its fortification could be about 10 miles at the least. The ruins of more than 200 Temples and many fine stone houses were seen."

চিতোর গড় ৬৯০ একর জমি জুড়ে আছে। এর চেহারাটা অনেকটা মাছের মত। অবস্থান আরাবল্লী পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বদিকে। East longitude—74°44', North longitude—24°52' শীতকালে ভয়ানক শীত। গরমকালে ভয়ানক গরম। অতিবৃষ্টির ফলে মাঝে মাঝে গাম্ভিরী নদী ভেসে যাওয়ায় দুর্গের পথ-ঘাট জলে ডুবে যায়। তবে এখানকার সাধারণ বৃষ্টিপাত 25".

গল্প-গাথায় যেমন বলা হয় এ-দুর্গ নির্মাণ করেন মহাভারতের ভীম। আবার ইতিহাস বলে এ-দুর্গের নির্মাতা চিত্রাংগদ্। তিনি মৌর্যদের প্রধান ছিলেন। এবং এই চিতোর গড়ে সতেরো শতকে রাজত্ব করে গেছেন। তিনি এই গড়ের নাম দিয়েছিলেন চিত্রকূট। মেওয়ারের মুদ্রায় এই নাম পাওয়া যায়। দুর্গের মধ্যে এখনো রাজপ্রাসাদ এবং তাঁর নামে একটা জলাশয় আছে। চিত্রাংগদের পরে আর কোন মৌর্য রাজা এখানে রাজত্ব করেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে দু'একজনের নাম পাওয়া যায়। Col, Todd বলেছেন,—অনেকে মনে করেন এ দুর্গ গুপ্তযুগে তৈরী। তবে সর্বজনস্বীকৃত যে বাপ্পা রাওয়াল এই চিতোর আরবদের কাছ থেকে 737 A.D.-তে কেড়ে নেন। অনেকে মনে করেন তিনি স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর। এরপর বাপ্পা রাওয়াল কাবুল, কান্দাহার, ইরাণ, তুরাণ ইত্যাদি জয় করেন। চিতোরে মেওয়ার রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশ

সেখানে ১২০০ বৎসর রাজত্ব করে গেছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে এই চিতোর ক্রমাগত হাতবদল হতে থাকে। এবং শেষে গুজরাটের বাহাদুর শাহের কাছ থেকে আকবর এই চিতোর 1567 A.D.-তে শেষবারের মত নিয়ে নেয়। এরমধ্যে এই চিতোরকে কেন্দ্র করে এত যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে যে, তাতে রাজপুতদের শৌর্য ও যুদ্ধের বীরত্ব সোনার অক্ষরে লেখা আছে।

"During those times of sacking and storming, it was remorselessly treated and its work of art got ruined."

আকবর যখন এই চিতোর গড় দখল করে নেন তখনো সেখানে রাতপুতদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে।

"There were in the fort 8000 fighting Rajputs, 1000 musketeers and 40000 peasants. Thirty thousand of them were killed in cold blood. Almost all the brave Rajputs of all ranks and file perished and the temples and palaces were razed to the ground. As a result, the capital of Mewor was shifted to Udipur, during the regim of Rana Udisingh."

চিতোরের শেষ বীর রাণা প্রতাপ। যাঁকে 'Incornation of Freedom' বলা হয়। তাঁর পিতার সময় যখন আকবর চিতোর আক্রমণ করে তখনই তিনি 'War Council'-এর সদস্য ছিলেন। কথিত আছে তিনি তিনটি শপথ করেছিলেন। সোনা এবং রুপোর বাসনে খাবেন না। কোন গালিচায় শোবেন না এবং নিজের গোঁফ মোচড়াবেন না। রাণা প্রতাপ আরাবল্লী পর্বতের গুহায় নিজের ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে অনেক কষ্টে বাস করেছেন কিন্তু আকবরের কাছে মাথা নত করেননি। আকবরের সঙ্গে এই গরিলা যুদ্ধের আগে তিনি হলদিঘাটে দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং সেখানেই তাঁর প্রিয় ঘোড়া চৈতক মারা যায়। এরপর প্রতাপ মেওয়ারের নানা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন তবুও চিতোর উদ্ধারের আশা ত্যাগ করেননি। ভবিষ্যতে তিনি চিতোর ছাড়া আর সবই জয় করেছিলেন এবং 1597 A.D.-তে মারা যান।

"Though his mortal body left him, his immortal soul still Services on the earth in the form of his great example of noble spirit, indomitable courage and mortial bravery".

দেখা যাচ্ছে এরপর চিতোর 1615 A.D-তে রাণা অমরসিংহের হাতে আসে এবং জাহাঙ্গীরের সঙ্গে এক সম্মানিত সর্ত হয়।

চিতোর সম্পর্কে দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি নানা মত ব্যক্ত করেছেন। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের রীডার Shri G. N. Sharma, M. A., P. H. D. বলেছেন ঃ

"Few forts in the world could claim the long continuity and status that Chittor has enjoyed".

চিতোরের গুণাগুণকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

1. Brief history of the fort and its monuments.
2. Heroism and chivalry of its people.
3. Development of Culture, Religion, Art and Architecture relating thereto through the ages".

রাজস্থান সরকারের Archaeology and Museums Department-এর Director Shri Satya Prakash বলেছেন ঃ

"Chittor—Heroic land of Mewor. Mewor in Rajasthan has a romantic history and in Mewor, Chittor is the area, which is supposed to have enacted several seenes relating to the 1st. struggle against the attempts made for foreign domination.
Archaeological researches have gone to show that the bank of Gambhir, on which the historic fort of Chittor stands, was the abode of early man in Rajasthan about a lac of years back. From this area have been brought to light hundreds of Palacoliths, which give us a Glimpse into the food gathering—devices of the early man and the manner in which he eked out his existence by defending himself against the attacks of wild animals, whom he hunted down for his food. Not much is known about Chittorgarh fort till we come to the 8th Cent. A.D. to which period the renovated temple of Kalikaji belongs. This is the earliest extant Temple in Mewor, as is proved

by the remnants of the old architectural details, which, fortunately, service even to this day.

With this achievement of Chittor from the point of view of antiquity, a word may be said about the grandeur of the fort of Chittor, which took one month for Akbar, the great, to complete its investment. Even when Emperor Akbar had moved to the foot of the fort and encamped in the wide plain, North-East of it, it took sufficient time for Akbar and his men to make a circuit of the gigantic fort. The fort in those days was so well defended and provisioned that the Moghal Engineers had to survey its base and also to study carefully its defences and weak points. Standing on a 400 to 500 ft. high isolated hill, rising steeply from the surrounding plain and being from North to South, some three miles and a quarter in length and about 1200 yards in breadth from East to West in the Centre, Chittor fort with its circumference at the base, extending a little over eight miles, presented only one hindrance in its defence and that was in the form of the surrounding plains. The presence of a hillock called Chittori at a short distance to the South of the fort, on the other hand, afforded facilites to the invader. The Royal palaces, some residential buildings and monkets were all situated within the fortification. The modern Town of Chittor come into existence long after Akbar's days. The fort had originally seven gates in two suspentive bends of the fortification of Chittor.

Though Rana Udaisingh and his family had left the fort for the hills Girwa (i.e., modern Udipur District) Rana had not left the fort to the mercy

of Akbar. He had, on the other hand, provided the fort with proper means of defence.

Eight thousand gallant Rajput Soldiers under the Command of Jaimal and a thousand expert musketeers from Kalpi had been stationed in the fort and supplied with provisions to last for several years. Rana Udaisingh had also left no means for the enemy to get food and fodder for its beasts of burden.

Akbar tried his plans one after another, to capture this impregnable fort but all its assaults were repulsed with slaughter. It was only the mining of the walls and the bestions of the fort that ultimately helped the Emperor and his men to capture the fort, although the Moghals suffered casualties at the rate of one hundred men a day. Such was the historic fort of Chittor, which though in ruins, even to this day, inspires visitors who, of their own accord, one moved to pay their homage to the valour and chivalry, which was once hornessed to defend the motherland and her freedom. Chittorgorh is full of such sports as thrill visitors. Stones speak, but they speak eloquently to those who have trained ears through symbols rather silently. In Chittorgorh fort stones speak silently to tell the story of the heroic deeds of the sword and shield. The listener is at once carried on that basis, into that realm where freedom raised its sword against slavery and where indomitable will fought against brutal force.

Chittorgorh, in short, presents a fitting challange to the brutal force and serves as an eternal sources of inspiration.

Here not only the brave sons of Mewor faught for the freedom of their motherland, but the

speechless nurslings, infants, and members of the fair sex also embraced the burning fire and refused to be captives. The Rajput heroines ascended the pyre also duly accompanied by strains of music and prayer.
Mother and virgins performed Jauher (act of self immolation) with awe-inspiring courage and concious pride. All such acts of bravery, shown by both males and females of mewar, have not only immortalised those, who, died inside the fort for the freedom of their land, but also the fort itself whose honour they tried to preserve."

চিতোর গড়ের কথা বলতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষের মরুভূমি এবং রাজস্থানের কথা আসে।

তৎকালে ভারতবর্ষের মরুভূমি অর্থে বোঝানো হ'ত কয়েকটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্ররাজ্য ও নগরের সমষ্টি মাত্র। এর উত্তরে গারা নদীর অনন্ত বালুকাময়ী সৈকতভূমি। পূর্বে আরাবল্লী পর্বতের অভেদ্য প্রাকার। দক্ষিণে রিণ নামে বিশাল লবণ জলাভূমি এবং পশ্চিমে সিন্ধুনদের তীরবর্তী বিশাল প্রান্তর। এই বিশাল ক্ষেত্র অতীতে প্রামার নরপতিগণের অধীনে ছিল। কিন্তু তৎকালীন ঐতিহাসিকগণ এইসব নরপতিদের কোনপ্রকার ধারাবাহিক বৃত্তান্ত রেখে গেছেন কিনা আজ আর জানবার কোন উপায় নেই। অতীতে যে এই মরুভূমি আরও কতদূর বিস্তৃত ছিল, তার বিবরণ কোন গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ভৌগোলিকগণ এই মরুভূমির একটা রাজধানীর সীমানা উল্লেখ করে তার নাম দিয়েছেন 'সুন্দর নগর'। এসব বহু অতীতের কথা।

মরুভূমির সীমানা উল্লেখের পরেই প্রশ্ন আসে রাজস্থানের। রাজস্থানের সীমানা ও ভাগ।

Col. Todd এই রাজস্থানকে আট ভাগে ভাগ করেছেন।

১. মিবার বা উদয়পুর
২. মারাবার বা যোধপুর
৩. বিকানীর বা কিষণগড়
৪. কোটা } বা হারাবতী
৫. বুন্দী }
৬. অম্বর বা জয়পুর
৭. যশলমীর
৮. আসিন্ধু-বিস্তৃত ভারতীয় মরুদেশ

যে সকল প্রাচীন গ্রন্থে এই সমস্ত দেশীয় রাজ্যের রাজপুতদের বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে 'রাজ-বিলাস', 'রাজ-রত্নাকর' এবং জয়-বিলাসই অধিক প্রসিদ্ধ এবং বিশ্বাসযোগ্য। এ-ছাড়া 'কমলমীরের' 'দেবধাত্রী' মহাদেবীর মন্দির থেকে 'সামদেব প্রশিস্ট' গ্রন্থ এবং নানা জৈন পুরোহিতদের কাছ থেকে মিবার সম্পর্কে নানাপ্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিবরণে যদিও মতবিরোধ আছে, তবুও দেখা যাচ্ছে যে,তার মধ্যে একমাত্র কনক সেনকেই মহাত্মনুরা রাণা কুলের প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। কম পক্ষে দশখানা কুলতালিকা বা বংশ-পরিচয় গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কনক সেন ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ থেকে যাত্রা করে ১৪৪ খ্রীঃ সৌরাষ্ট্র দ্বীপে এসে উপস্থিত হন। অম্বর প্রদেশের সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও ঐতিহাসিক মহারাজ জয়সিংহ তাঁর নিজের ইতিহাস গ্রন্থে এই মতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সেই গ্রন্থে আরো বলা আছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লব লাহোর রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। লব থেকে ৫৫ পুরুষ পরে সূর্যবংশে সুমিত্র নামে এক নরপতি বিক্রমাদিত্যের সময়ে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মিবারের রাণাগণ এই সুমিত্র বংশ-সম্ভূত।

সেই সময়ে দেশীয় রাজগণের রাজ্যের মধ্যেও প্রত্যেক নগরেই এক-একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র সভা ছিল। এই সভাগুলো স্থানীয় স্বাস্থ্য রক্ষা, শান্তি-বর্ধন, নানা সামাজিক কাজ ও শাসন-সম্বন্ধীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধান এবং রাণা আজ্ঞাধীনে না থেকে, প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা প্রস্তুত করতেন। রাজার হাতে কেবল রাজ্য রক্ষার ভার থাকতো। এবং প্রজারা তার জন্যে রাজাকে কর দিত। রাজা কর নিয়ে প্রজাদের পুত্রের মত পালন করতেন। প্রজারা রাজার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করত। এই ব্যবস্থারই প্রকৃত নাম ছিল স্বায়ত্তশাসন। এবং আত্মশাসন সমিতির নাম ছিল পঞ্চায়েৎ। পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরাই গ্রামের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতেন। রাজার এ-ব্যাপারে কোন হাত ছিল না। মেবারের রাণারা যদি কোন সামন্তকে কোন ভূমিদান করতেন অথবা রীতিমত আদেশপত্র দিয়ে তার স্বত্ত্বাধিকার প্রদান করতেন, তাহলেও সেই রাজদণ্ড দানপত্রের চেয়েও, প্রজারা যদি কোন ভূমির কোন স্বত্ত্ব অপর কাউকে প্রদান করতেন, সেই দানপত্রই অধিক বলবৎ বলে গণ্য করা হত। সেই কারণে সামন্তগণ রাণাদের কাছে না গিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে জমির স্বত্ত্ব ক্রয় করত। প্রজারা খুশীমত তাদের জমিতে চাষ করত এবং তিন বৎসর অন্তর কর দিত। ক্ষেতে যত ফসল হত তার ওপর কর ঠিক করা হত।

মেবারের ভূমি রাজস্ব কি পরিমাণে পরিবর্ধিত হত, তার একটা নমুনা নীচে দেওয়া হল।

১৮১৮ খ্রীঃ বাসন্তী শষ্য কাটার সময়ে —	৪০০০০	টাকা
১৮১৯ " " " " " —	৪৫১২৮১	,,
১৮২০ " " " " " —	৬৫৯১০০	,,
১৮২১ " " " " " —	১০১৮৪৭৪	,,
১৮২২ " " " " " —	৯৩৬৬৪০	,,

অতীতে মেবারের বাণিজ্য শুল্ক কেমন ছিল তার নমুনা ঃ

১৮১৮ খৃীঃ —	নামমাত্র	টাকা
১৮১৯ " —	৯৬৬৮৩	,,
১৮২০ " —	১৬৫১০৮	,,
১৮২১ " —	২২০০০০	,,
১৮২২ " —	২১৭০০০	,,

বাড়ীর সংখ্যা ঃ

	১৮১৮ খ্রীঃ বাড়ীর সংখ্যা	১৮২২ খ্রীঃ বাড়ীর সংখ্যা
উদপুর—	৩৫০০	১০০০০
ভীলবারা	×	২৭০০
পুর—	২০০	১২০০
মণ্ডল—	৮০	৪০০
গোগুন্দা—	৬০	৩৫০

রাজস্থান সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণার পর এই রাজস্থানের বাসিন্দাদের অতীত ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করা যেতে পারে। রাজস্থানে যাঁরা বাস করেছেন তাঁরা রাজপুত। কিন্তু তাঁরা কোথা থেকে এলেন ? তাঁদের বংশ পরিচয় কি, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। কারণ এই রাজপুতেরাই চিতোর গড়ে দীর্ঘকাল রাজত্ব করে গেছেন।

* * * * *

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে যে বীর আর্য নৃপতিরা অনন্ত নিদ্রায় শয়ন করেছিলেন তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশীয় সন্তান-সন্ততিরা সচরাচর "রাজপুত্র" নামে অভিহিত হতেন। এই 'রাজপুত্র' শব্দেরই অপভ্রংশ "রাজপুত"। ভারতবর্ষের যে বিশাল প্রদেশে এই সমস্ত রাজপুতদের আবাসভূমি ছিল, তার পরিশুদ্ধ নাম "রাজস্থান"। চলিত ভাষায় এই রাজস্থানকে অতীতে "রাজবারা" এবং সাধুভাষায় 'রায়থানা' নামে অভিহিত করা হত। তারপর ইংরাজেরা রাজপুত-রাজ্য বোঝাবার জন্যে 'রাজপুতানা' শব্দের সৃষ্টি করেছিল। এই 'রাজপুতানা' শব্দটি "রায়থানা" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

এক সময়ে এই রাজস্থান মুসলমান বীর সাহেব-উদ্দীনের অধীনে ছিল। তখন এই রাজস্থানের সীমানা যে কতদূর বিস্তৃত ছিল তা অনুমান করা কঠিন। অনেকে অনুমান করেন যে, তখন এই রাজস্থানের সীমানা গঙ্গা-যমুনা অতিক্রম করে হিমাচলের চরণতল চুম্বন করেছিল। কিন্তু সেই ভারত-বিজেতার অভ্যুত্থানের পূর্বে এর সীমানা আরো বেশী বিস্তৃত ছিল। প্রাচীন ধারা-নগরী ও আনহলু বারা-পত্তন বিধ্বস্ত হলে, সে সময়ে মুসলমান-গণ উক্ত নগরদ্বয়ের ধ্বংশরাশীর ওপর মান্দু ও আক্কদাবাদ নগরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে সময়ের ইতিহাসে এই রাজস্থানের বিশাল পরিসর কতদূর বিস্তৃত ছিল, তা' তৎকালীন সীমা বিবরণ দেখলেই বোঝা যায়।

তখন রাজস্থান উত্তরে—শতদ্রু নদীর দক্ষিণস্থ জঙ্গলদেশ নামধারী মরুদেশ, পূর্বে—বুন্দেল খন্ড, দক্ষিণে-বিন্ধ্যমেরুর অটল পাষাণ প্রাচীর, এবং পশ্চিমে-সিন্ধুনদের সুদীর্ঘ সৈকতভূমি—এই চতুঃসীমায় আবন্ধ ছিল।

ইতিহাস বলে এই চতুঃসীমায় আবন্ধ বিশাল ভূভাগে রাজপুত নামধারী বীর জাতি বাস করতেন। এঁরা সূর্য ও চন্দ্রবংশ থেকে উদ্ভূত।

সূর্য ও চন্দ্রবংশঃ জগতের মধ্যে এ দুটি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বংশ। সূর্য ও চন্দ্রবংশের আগে ভারতে অথবা জগতের অন্য কোন দেশে অন্য কোন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল কিনা, তার কোন বিবরণই জগতের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় না। চীন, আশিরিয়া ও মিশরের যে তিনটি প্রাচীন রাজবংশের বিবরণ পাওয়া যায়, তারা ভারতের সূর্য ও চন্দ্রবংশ প্রতিষ্ঠার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত। ফলে এই দুটি মহৎ বংশই জগতের অন্যান্য প্রাচীন বংশের মধ্যে অন্যতম। ভগবান সূর্যের পুত্র মনু সূর্যবংশের ও ভগবান চন্দ্রের পুত্র বুধ চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই দু'জন মহাপুরুষ প্রায় ঠিক একই সময়ে নিজেদের বিশাল বংশ এই ভারতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে বুধদেবকে ভগবান মনুর এক পুরুষ পরে বলে ধরে নিতে হয়। কেননা তিনি মনুর এক পুরুষ পরে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর দুহিতাকে বিবাহ করেছিলেন। পুরাণ-প্রভৃতি গ্রন্থে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজবংশের যে বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়, সে সমস্ত বংশই এই দুটি বংশের শাখা-প্রশাখা মাত্র।

কোন সময়ে যে এই সূর্য ও চন্দ্রবংশের রাজাদের এই আদি পুরুষ দু'জন আর্যাবর্ত ভূমে এসেছিলেন, তা' অনুমান করা কঠিন। তবে প্রসিদ্ধ পুরাণ-প্রভৃতি গ্রন্থে এ-বিষয়ে যে কিছু বর্ণনা আছে, তা' পড়লে এ কথাই মনে হয় যে, সূর্যকুলের প্রতিষ্ঠাতা মনু সপ্তম মন্বন্তর কালে আবির্ভাব হয়েছিলেন। এই কালান্তক বিবরণ নিয়েই জগতের প্রায় সমস্ত আদি সৃষ্টি

গ্রন্থই রচনা হয়েছে। কেননা এ-বিষয়ে সকল গ্রন্থেই প্রায় একই রকম বিবরণই লক্ষ্য করা যায়।

ভগবান মনু সম্পর্কে এক চমৎকার ইতিহাস প্রচলিত আছে। কথিত আছে, সেই সপ্তম মন্বন্তর কালে ভগবান বৈবশ্বত মনু একটা কৃতমালা নদীতে তর্পণ করছিলেন। এমন সময় একটা ছোট মাছ নদীর স্রোতে তাঁর অঞ্জলি মধ্যে এসে যায়। তা'তে ভগবান মনু তাকে নদীর জলে ফেলে দেবার উপক্রম করলে সে মাছ তাঁকে সেকাজ করতে বারণ করে বললোঃ হে নরোত্তম! আমাকে জলের মধ্যে ফেলে দিও না। আমি এখন কুমীর এবং অন্যান্য জলজন্তুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। অতএব আমাকে অন্য কোন জায়গায় রেখে রক্ষা কর। মাছের এই কথা শুনে ভগবান মনু তাকে একটা কলসীর মধ্যে রেখে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেই মাছ আরো বড় হয়ে উঠলো। এবং আরো বড় পাত্র প্রার্থনা করল। তখন মনু তাকে একটা সরোবরে রেখে দিলেন। সরোবরে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মাছের শরীর আরো বেড়ে গেল। তখন মনু তাকে সাগরে নিক্ষেপ করলেন। সেই মাছ সেখানেও নিজের দেহকে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ-যোজন বিস্তৃত করে ফেললো। তখন মনু অতি বিস্মিত হয়ে ভক্তিপূর্ণভাবে বললেনঃ হে ভগবন! আপনি কে? কেন আমাকে বৃথা মায়ায় বঞ্চনা করছেন। তার উত্তরে মাছ বললোঃ আজ থেকে সাতদিনের মধ্যে এই সাগর উদ্বেল হয়ে সমস্ত জগৎ-সংসারকে প্লাবিত করবে। তুমি এই অবসরে প্রত্যেক জীব, জন্তু ও বৃক্ষ-লতা-গুল্মের এক-একটা বীজ নিয়ে সাতজন ঋষির সঙ্গে নৌকায় আরোহণ করে আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো। আমি লে তুমি সেই নৌকা আমার সঙ্গে বেঁধে দিও। তাহ'লে তোমরা এ বারের মত রক্ষা পেয়ে যাবে।

এটা একটা কথিত গল্প। কিন্তু এদিকে ভবিষ্যৎ পুরাণে দেখা যাচ্ছে যে, এই বৈবশ্বত মনু সুমেরু পর্বতে রাজত্ব করতেন। ককুৎস্থ নামে তাদের জনৈক বংশধর অযোধ্যা নগরে আধিপত্য করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এবং ক্রমে তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ সেই গিরি প্রদেশ থেকে জগতের সকল দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলেন।

সেই পবিত্র সুমেরু সম্পর্কে নানা দেশীয় ধর্মগ্রন্থে অতি বিচিত্র বিচিত্র বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকগণ আপন আপন রুচি অনুসারে এই ঘটনাকে নানাভাবে বর্ণনা করে নিজেদের উপাস্য দেবতার আবাসভূমি বলে নির্ণয় করেছেন। ব্রাহ্মণগণ একে বাঘেশ আদীশ্বর মহাদেবের, জৈনগণ জৈনাধীশ আদিনাথের এবং গ্রীকগণ বেকশের আবাসভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। ফলে বিশেষ

সতর্কতার সঙ্গে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পরীক্ষা করে দেখলে স্পষ্টই প্রমাণ হবে যে, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রুচির ব্যক্তি কল্পনাই মানব জাতির একমাত্র আদি পুরুষকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তা'হলে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি যে, গ্রীক এবং হিন্দু এক পরিবারগত ভ্রাতা। এবং তখনি স্থির প্রতীতি জন্মায় যে, আদীশ্বর, আদিনাথ, অশিরীশ, বাঘেশ, বেকশ, মনু, মনুষ ইত্যাদি সেই একমাত্র মানব পিতার ভিন্ন ভিন্ন অভিধা মাত্র। এবং সর্বসমন্বয়ে সেই মানব-পিতা যে ভগবান মনু, জগতের ইতিহাসে তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য আছে।

সেই দেব-নিলয় সুপবিত্র সুমেরু-শিখর পরিত্যাগ করে দেব সদৃশ বৈবশ্বত মনু সিন্দু-গঙ্গার পূত সলিল বিধৌত পুণ্য ভূমি আর্যাবর্তে এসে নিজের বিশাল বংশতরু রোপণ করেন। সে তরু ক্রমে অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হয়ে ভারতের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অমরাবতী তুল্য অযোধ্যা নগরীতে দীর্ঘকাল ধরে যে সকল মহিমান্বিত আর্য নৃপতিরা রাজত্ব করে গিয়েছিলেন, ভুবন-বিদিত ভগবান রামচন্দ্র তাঁহাদের কুলতিলক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁহার অমৃত-চরিত কবিগুরু বাল্মীকিই প্রথম গাথাবদ্ধ করেন। মনু এই সূর্যবংশেরই আদি পুরুষ। সেই মনু থেকে ভগবান রামচন্দ্র পর্যন্ত সর্বসমেত ৩৬ জন নৃপতির বর্ণনা বাল্মীকি দিয়ে গিয়েছেন।

অযোধ্যা নগরীই সূর্যবংশীয় নৃপতিগণের প্রথম ও প্রধান কীর্তি। ভগবান মনু এ-নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। কোন্ সময়ে যে এই প্রসিদ্ধ নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা নির্ধারণ করা কঠিন। এক সময়ে এই মহানগরী যে মর্তে অমরাবতী তুল্য ছিল, সে কথা কবিগুরু বাল্মীকির রচনাতেই পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আগে এ-ধরনের সমৃদ্ধশালী নগরী ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। কিন্তু অযোধ্যা নগরীর এই সৌন্দর্য-গৌরব এবং সমৃদ্ধতা একদিনে আসেনি। এ-নগরী সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধতার শীর্ষস্থানে এসেছে ক্রমে ক্রমে।

অযোধ্যা নগরী প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালেই মহারাজ ইক্ষাকুরের পৌত্র—মিথি, মিথিলাপুরী স্থাপন করেছিলেন। মিথির পুত্রের নাম মহর্ষি জনক।

অযোধ্যা ও মিথিলার আগে সূর্যবংশের রাজারা ভারত ভূমিতে আর অন্য কোন নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে এই দুটো নগরী প্রতিষ্ঠার পর ভগবান মনুর বংশধরগণ রোতস, চম্পাপুর, ইত্যাদি নামে আরো কয়েকটা ছোট ছোট নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের লব ও কুশ নামে যে দু'টো যমজ পুত্র হয়েছিল, তার মধ্যে লব

থেকেই মেবারের রাণাগণ নিজেদের উৎপত্তি প্রমাণ করে থাকেন। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশ থেকে মারবার ও অম্বরের রাজাদের উৎপত্তি। শ্রীরামচন্দ্রের পর সর্বসমেত ৫৮ জন রাজা অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের শেষ বংশধরের নাম সুমিত্র। সুমিত্রের পর আরো অনেক রাজা সূর্যকুলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে সমস্ত নরপতি মেবারের রাণাদের পূর্বপুরুষ।

আর্যবীর রাজপুতদের আচার-ব্যবহার, সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম-নীতির সঙ্গে জগতের অন্যান্য জাতি-সমূহের সাদৃশ লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই মনে হয় এ'রা সকলেই একই আদি বংশ থেকে উদ্ভূত।

ভারতবর্ষের এই দুটি মহৎ কুলের সঙ্গে কালক্রমে আরো একটি বৃহৎ কুল যুক্ত হয়। তার নাম অগ্নিকুল। অগ্নিকুলের রাজারা এক সময়ে প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে ভারতবর্ষ শাসন করেছিলেন। এমন কি সূর্যকুলের অতীত গৌরব ও অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে এই তিনটি বিশাল রাজকুলের সঙ্গে আরো তেত্রিশটি ছোট ছোট রাজকুল সংযুক্ত হয়েছিল।

কালক্রমে এই সকল অগ্রনায়কগণ স্ব স্ব নামানুসারে এক একটি স্বতন্ত্র কুল স্থাপন করে জগতে অমরত্ব লাভ করেছিলেন। সেই স্বতন্ত্র কুলের মধ্যে বিখ্যাত একটি কুলের নাম গ্রহলোট বা গিহেলাট্।

গিহেলাট্ কুলের বংশধরেরা নিজেদের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। রাজস্থানের ভট্টেরাও এই মতকে সমর্থন করেছেন। মহারাজ সুমিত্রের পর আর কোন সূর্যবংশীয় নরপতির নাম কোন পুরাণে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই গিহেলাট্ বংশের নৃপতিরা যে মহারাজ সুমিত্রবংশ থেকে উদ্ভব এ-কথা প্রমাণ করেছেন।

ঠিক কোন্ সময়ে যে এই গিহেলাট্ বংশের আদি গোত্রপতি নিজেদের পিতৃপুরুষের আদি বাসস্থান অযোধ্যা নগরী ছেড়ে চলে আসেন, তা অনুমান করা দুঃসাধ্য। তবে ইতিহাস অনুসন্ধানে মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রীরামচন্দ্রের বহুপুরুষ পরে অনুমান সম্বৎ ২০০ (খ্রীঃ ১৪৪) অব্দে কনক সেন নামে জনৈক সূর্যবংশীয় রাজা নিজেদের পিতৃরাজ্য ছেড়ে সৌরাষ্ট্র দেশে চলে আসেন এবং সেখানে নিজের বিশাল বংশতরু রোপণ করেছিলেন। রাজ্যধনে বঞ্চিত হয়ে পাণ্ডবগণ যে বিরাট নগরে আত্মগোপন করে অজ্ঞাতবাস কাল অতিবাহিত করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর মহারাজ কনক সেন সেই বিরাট নগরেই নিজের প্রথম রাজপাট সুরু করেন। তারপর কয়েক পুরুষ পরে সেই বংশেরই রাজা বিজয় সেন সেখানে বিজয়পুর নামে একটা বড় নগর স্থাপন করেছিলেন।

মহারাজ কনক সেনের পরবর্তী বংশধরেরা অনেকদিন ধরে বল্লভীপুরের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। সেখানে তাঁরা ক্রমে ক্রমে 'বালকরায়' নামে পরিচিত হলেন। কি সূত্রে এবং কোন কারণবশতঃ সূর্যকুল তিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বংশধরগণ এই 'বালকরায়' উপনাম গ্রহণ করলেন তা অনুমান করা কঠিন। তবে ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা প্রায় এক হাজার বছর এই উপাধি বহন করে এসেছেন।

পরে অনিবার্য প্রভাবে ও কালস্রোতে এই 'বালকরায়'-এর বংশ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল। অবশেষে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁদের শেষ রাজা মহারাজ শিলাদিত্য ম্লেচ্ছ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে যুদ্ধে মারা গেলে, এই প্রদেশে সূর্যকুলের বংশতরু শেষ হয়ে গেল। পরে এই বংশেরই এক পুত্র গ্রহাদিত্য এই প্রদেশের কাছাকাছি ইদর নামক স্থানে নিজের রাজ্য স্থাপন করে রাজত্ব সুরু করেন। এই গ্রহাদিত্য বংশ থেকেই 'গ্রহলোট' বা 'গিহেলাট্' নামের উৎপত্তি।

এঁরাও পরে আবার এই স্থান ত্যাগ করে আহর নামক এর জায়গায় চলে আসেন এবং রাজত্ব সুরু করেন। এঁদের বলা হত 'আহঘ'। কিন্তু পরে এঁরাই আবার নিজেদের শিশোদীয় বলে চালাতে সুরু করেন। এবং এই বংশই ভবিষ্যতে ইতিহাসে বলবতী হয়ে ওঠে। এঁরা পরে সম্পদে ও বিপদে এই শিশোদীর নাম আর পরিবর্তন করেননি। এঁরাই ভবিষ্যতে এই শিশোদীয় বংশের জ্বলন্ত গৌরবময় ইতিহাসকে আর্যাবর্তে দীর্ঘদিন বলবৎ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গিহেলাট্ কুল সর্বসমেত ২৪টি শাখায় বিভক্ত। তার মধ্যে আহর্ঘ ও শিশোদীয়-ই বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিশোদীয় বংশ থেকেই উদ্ভূত কনক সেন, বিজয় সেন ইত্যাদি অতিক্রম করে শেষে বাপ্পারাওল-এ স্পর্শ করে। যিনি চিতোর গড়ের প্রতিষ্ঠাতা।

সমসাময়িক গিহেলাট্ ও মুসলমান নৃপতিগণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হল।

গিহেলাট্	আবির্ভাব কাল		মুসলমান	আবির্ভাব কাল	
	সম্বৎ	খ্রীষ্টাব্দ		সম্বৎ	খ্রীষ্টাব্দ
বাপ্পার জন্ম	৭৬৯	৭১৩	বোগদাদের খলিফাগণ		
তৎকর্তৃক চিতোর অধিকার	৭৮৪	৭২৮	ওয়ালিদ (১১শ খলিফা)	৮৬-৯৬	৭০৫-৭১৫
,, মেবার শাসন	...	...	ওমার দ্বিতীয় (১৩শ ঐ)	৯৯-১০২	৭১৮-৭২১

গিহেলাট্	আবির্ভাব কাল		মুসলমান	আবির্ভাব কাল	
	সম্বৎ	খ্রীষ্টাব্দ		সম্বৎ	খ্রীষ্টাব্দ
তৎকর্তৃক চিতোর ত্যাগ	৮২০	৭৬৪	হুষাস (১৫ শখলিফা)	১০৪-১২৫	৭২৩-৭৪২
অপরাজিত—	...	...	আলমানসুর (২১শ ঐ)	১৩৬-১৫৮	৭৫৪-৭৭৫
খলভোজ—	...	...			
খোমান—	৮৬৮ ৮৯২	৮১২ ৮২৬	হারুল-আল-রসিদ (২৪শ খলিফা)	১৭০-১৯৩	৭৮৬-৮০৯
ভর্তৃভাট—	...	...	আলমামুন (২৬শ ঐ)	১৯৮-২১৮	৮১৩-৮৩৩
সিংহজী—	...	...	**গজনীর নৃপতিগণ**		
উল্লুট—	...	...	আলেপ্তিগিঁ	৩৫০	৯৫৭
নরবাহন—	...	...	সবেক্তিগিঁ	৩৬৭	৯৭৭
শালবাহন—	...	...	মহম্মদ	৩৮৭-৪১৮	৯৯৭-১০২৭
শক্তিকুমার—	১০২৪	৯৬৮			
অম্বপ্রসাদ—	...				
নরবর্ম—	...				
যশোবর্ম—	...				

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মেবারে যে বার্ষিক রাজস্ব আদায় হয়েছিল তার তালিকা ঃ—

বাসন্তিক শস্য — ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে — ৪০,০০০ টাকা
" — ১৮১৯ " — ৪,৫১,২৮১ "
" — ১৮২০ " — ৬,৫৯,১০০ "
" — ১৮২১ " — ১০,১৮,৪৭৮ "
" — ১৮২২ " — ৯,৩৬,৬৪০ "

বাণিজ্য-শুল্ক আদায় ঃ

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে — নামমাত্র আদায়
১৮১৯ " — ৯৬,৬৮৩ টাকা
১৮২০ " — ১,৬৫,১০৮ "
১৮২১ " — ২,২০,০০০ "
১৮২২ " — ২,১৭,০০০ "

মেবারভূমি রত্নগর্ভা ও স্বর্ণপ্রসূ। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কথা ছেড়ে দিলেও, এর গর্ভীরে যে অসংখ্য ধাতুখনি আছে তা যদি উপযুক্ত ব্যবহার করা হয় তবে মেবার অল্প সময়ের মধ্যেই আবার রাজস্থানের নন্দনকানন

হয়ে উঠতে পারে। মেবারের অনেক জায়গায় তাম্রখনি দেখতে পাওয়া যায়।

চিতোর গড়কে কেন্দ্র করে মেবারের অবস্থা মোটামুটিভাবে এখন তুলে ধরা হল। চিতোর গড়ে যাঁরা রাজত্ব করে গেছেন তাঁরা সূর্যবংশীয় পুরুষ। বাপ্পারাওল চিতোর গড় প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ যুগে অন্যতম পুরুষ। বাপ্পারাওলের বংশতালিকা পেশ করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই সূর্যবংশের প্রশ্ন ওঠে। সেই কারণে এখানে বাপ্পারাওলকে কেন্দ্র করে সূর্যবংশের তালিকা পেশ করা হল। সূর্যবংশের যে-সব পুরুষ চিতোর গড়ের সঙ্গে যুক্ত তাদের ছাড়া অন্য পুরুষদের তালিকা এখানে অনিবার্য কারণেই বাদ দেওয়া হল।

সূর্যবংশ তালিকা
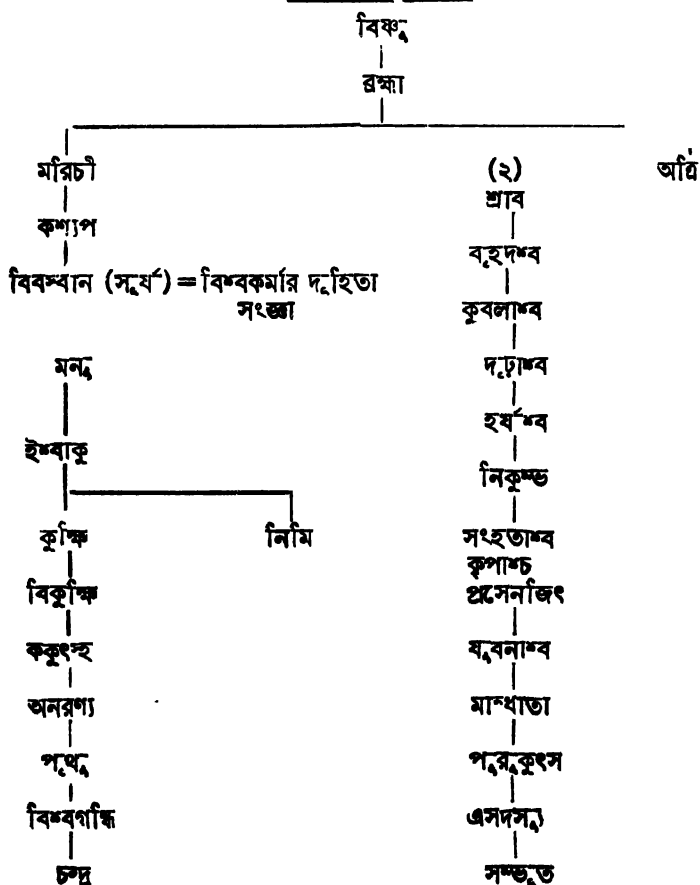
যুবনাশ্ব
সুধন্বা
ত্রিধন্বা
এয্যারুণ
(৩)
সত্যব্রত
হরিশ্চন্দ্র
রোহিত
হরিত
চঞ্চু
বিজয়
রুরুক
বৃষ
বাহু
সগর
অসমঞ্জ
অংশুমান
দিলীপ
ভগীরথ
শ্রুত
নাভাগ
অশ্বরীষ
সিন্ধুদ্বীপ
অজুৎজিৎ
ঋতুপর্ণ
(৪)
আর্তপর্ণি
সুদাম
সৌদাম
সর্বকর্মা
অনরণ্য
নিঘ্ন
অনমিত্র
রোহিত
হরিত
চম্প
সুদেব
বিজয়
ভরুক
বক
বাহুক
সগর
অসমঞ্জা
অংশুমান
ভগীরথ
(৫)
শ্রুত
নাভাগ
সিন্ধুদ্বীপ
অবতায়ু
ঋতুপর্ণ
সুদাম
সৌদাম
অশ্মক
মূলক
দশরথ
ঐড়াবিড়ি
বিশ্বসহ
দিলীপ
রঘু
অজ
দশরথ
রাম
ভরত
লক্ষ্মণ
শত্রুঘ্ন

শ্রীরামচন্দ্র

কুশ
অতিথি
নিষধ
নভ
পুণ্ডরীক
ক্ষেমধন্বা
দেবানীক
হীন
পারিযাত্র
শিল
শঙ্খনাভ
অশ্বরূপ
বিশ্বসহ
হিরণ্যনাভ
পুষ্প
ধ্রুবসন্ধি
সুদর্শন
(২)
অগ্নিবর্ণ
শীঘ্রগ
মরু
প্রসুশ্রুত
সুসন্ধি
অমর্ষণ
মহস্বান
বিশ্ববাহু
প্রসেনজিৎ
তক্ষক
বৃহদ্বল (যুধিষ্ঠিরের সমকালীন। ইনি ভারত যুদ্ধে অভিমন্যু হস্তে নিহত।)
বৃহদ্রণ
উরুক্রিয়
বৎসবৃদ্ধ
প্রতিব্যোম
ভানু
(৩)
দিবাক
সহদেব
বীর
বৃহদশ্ব
ভানুমান
প্রতীকাশ্ব
সুপ্রতীক
মরুদেব
সুনক্ষত্র
পুষ্কর
লব
(৪)
অন্তরীক্ষ
সুতপা
অমিত্রজিৎ
বৃহদ্রাজ
বর্হি
কৃতঞ্জয়
রণঞ্জয়
সঞ্জয়
শাক্য
শুদ্ধোদ
লাঙ্গল
প্রসেনজিৎ
ক্ষুদ্রক
সুমিত্র
[এরপর ভাগবতে আর কোন নৃপতির নামোল্লেখ নেই। কথিত আছে সুমিত্র বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক।]

মেবারের রাণাদিগের বংশাবলী
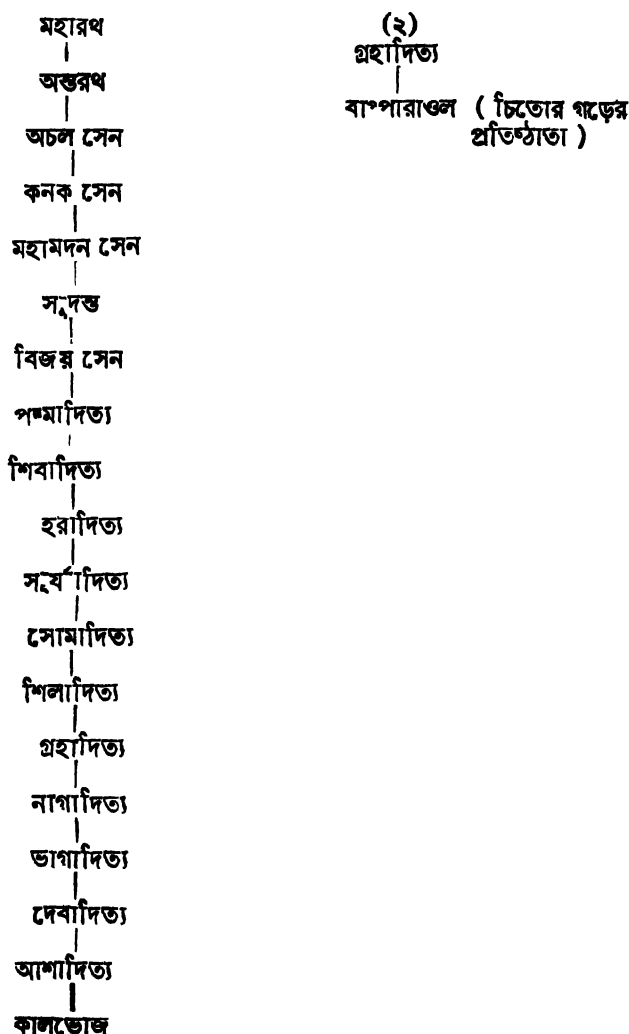
রাজপুতানা অনন্তকীর্তিময়ী। এইসব কীর্তির অধিকাংশই অনুষ্ঠিত হয়েছে রণভূমি চিতোরে। আত্মবিসর্জনের এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না।

স্পার্টার্ণ-রমণী প্রাণপুত্তলীকে যুদ্ধে পাঠাবার সময় তার হাতে ঢাল দিয়ে বলেছিলেন: বৎস! এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে এই ঢাল হাতে বিজয় গর্বে আমার কাছে ফিরে এস। তবেই আমি তোমাকে সম্বর্ধনা জানাবো।

তা যদি না পার তবে যুদ্ধে হত হয়ে এই ঢাল শয্যায় শায়িত অবস্থায় আমার কাছে আনীত হোয়ো। কিন্তু কিছুতেই যেন রণে বিমুখ অথবা পরাজিত হয়ে আমার কাছে এসো না।

তেজস্বিনী স্পার্টান-রমণীর এই কথার জন্যে তিনি আজো জগতে পূজিতা হয়ে আছেন।

সেই রকম রাজপুত রমণীরাও তাঁদের স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে নিজেরা বিলাস-ভবনে আমোদ-আহ্লাদে কাটাতেন না। নিজেরাও সমর সাজে অসি হাতে রণাঙ্গনে স্বামী বা পুত্রের পাশে দাঁড়িয়ে স্বদেশ এবং স্বজাতির জন্যে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিতেন। অথবা 'জহর' ব্রত পালন করতেন। সুতরাং এইসব রাজপুত রমণীরা স্পার্টান-রমণীদের চেয়েও বেশী পূজ্যা।

আগেই বলা হয়েছে, রাজপুত রমণীদের মত রাজপুতেরাও বীরত্বে ও আত্মোৎসর্গে জগতে অতুলনীয়। এক লিয়োনিডাসের বীরত্ব কাহিনীতে গ্রীস মুখর। কিন্তু রাজপুতানায় এই প্রকার কত শত লিয়োনিডাস নিজের দেশ রক্ষার জন্যে যুদ্ধে জীবন আহুতি দিয়েছে। এত বীরত্ব এবং সাহসিকতা আর কোন দেশ দেখাতে পারেনি। এবং চিতোর গড়ে ধারাবাহিক-ভাবে যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে থাকে ও দিনের পর দিন যত রাজপুতেরা ও রাজপুত রমণীরা প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে, এ-অনুষ্ঠান ইতিহাসে বিরল। কোন দেশেই এত বীরপুরুষ ও বীর রমণীর আবির্ভাব ঘটেনি। এক রাণা প্রতাপের বীরত্ব কাহিনীই চিতোর গড়ের বীরত্ব প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট।

বাপ্পারাওল চিতোর গড় প্রতিষ্ঠা করেন। বাপ্পারাওল হতে রাণা অমর সিংহ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় মেবারের ইতিহাসে শুধু হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুসলমানেরা বার বার চিতোর আক্রমণ করেছে এবং চিতোরের রাজপুতেরা বার বার সে আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছে। এ-সংঘর্ষ চলেছে পুরুষানুক্রমে। এবং শেষে উদয় সিংহের সময়েই চিতোর গড় আকবরের হাতে চলে যায়। উদয় সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপের বীরত্ব ইতিহাস সমর্থিত। তাঁর পুত্র অমর সিংহ ও চিতোর উদ্ধারের অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হতে পারেননি। অমর সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেবারের স্বাধীনতা সূর্য চিরতরে অস্তমিত হল। সেই দীর্ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধে কত হিন্দু রাজপুত ও রাজপুত রমণী প্রাণ দিয়েছিল তা হিসেবে আনা যাবে না। কত হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ভূমিসাৎ হয়েছিল তার কোন হিসেব নেই।

গল্প-গাথায় যেমন বলা হয়েছে, এ-দুর্গ নির্মাণ করেন মহাভারতের ভীম, আবার তেমন কিছু কিছু ঐতিহাসিকের মতে এ দুর্গের নির্মাতা চিত্রাংগদ্। তিনি মৌর্যদের প্রধান ছিলেন এবং এ দুর্গে সতেরো শতকে রাজত্ব করে গেছেন। তিনি দুর্গের নাম দিয়েছিলেন চিত্রকুট্। মেওয়ারের মুদ্রায় এই

নাম পাওয়া যায়। দুর্গের মধ্যে তাঁর নামে একটি রাজপ্রাসাদ ও জলাশয় আছে। চিত্রাংগদের পরে আর কোন মৌর্য রাজা এখানে রাজত্ব করেছেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু Col. Tod মনে করেন এ-দুর্গ গুপ্তযুগে তৈরী। তবে সর্বজন স্বীকৃত মত হচ্ছে যে, বাপ্পারাওয়াল এই চিতোর গড় আরবদের কাছ থেকে 737 A.D.-তে কেড়ে নেন। এরপর তিনি কাবুল, কান্দাহার, ইরান, তুরান ইত্যাদি জয় করেন। এই বংশ চিতোরে ১২০ বছর রাজত্ব করে গেছে। বাপ্পারাওয়াল চিতোর গড়ের প্রতিষ্ঠাতা এ কথা মেনে নিলেও তাঁর সিংহাসনে আরোহণ সম্পর্কে কিছু কিছু ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের গরমিল দেখা যায়। অনেকে বলেন বাপ্পা-রাওয়াল চিতোর গড়ের সিংহাসনে বসেন 737 A.D -তে। আবার অনেকে বলেন 728 A. D. বা ৭৮৪ সম্বতে। তখন বাপ্পারাওয়ালের বয়স মাত্র পনেরো। অনেক ঐতিহাসিকের মতে বাপ্পারাওয়ালের আগে চিতোর গড়ে রাজত্ব করে গেছেন মোরি বংশীয় রাজারা। বাপ্পারাওয়াল শেষ মোরি বংশের ভাগ্নে। মোরি বংশের শেষ রাজা তাঁর রাজ্যের সামন্ত বর্গের জায়গীর কেড়ে নেবার ফলে, তাঁরা জোট বেঁধে মোরিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে বাপ্পারাওয়ালকে সিংহাসনে বসান। বাপ্পারাওয়াল গিহেলাট্ বংশীয় হলেও মেবারের শীশোদিয়া বংশীয় রাজবৃন্দের আদিপুরুষ। আগেই বলা হয়েছে, যে এই বংশ সূর্য বংশ থেকে উৎপন্ন। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব থেকে এই বংশের আবির্ভাব। লব লবকোট বা লাহোর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বংশধরেরা দীর্ঘদিন সেখানে রাজত্ব করেন। লব-বংশের যে শাখা থেকে মেবারের রাণাগণের উৎপত্তি, সেই শাখার অন্যতম রাজা কনক সেন সেখান থেকে চলে এসে দ্বারকায় নিজের রাজ্য স্থাপন করেন। সেই সময়ে এই বংশ সেন-বংশ নামে পরিচিত ছিল। এরপর এই সেন-বংশীয় রাণারা স্থান পরিবর্তন করে অন্যস্থানে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। এই স্থান পরিবর্তনের ফলে এবং আরো নানা কারণে এই ঘেলোট্ বংশ নামে পরিচিত হতে আরম্ভ করে। এই ঘেলোট্ বংশ প্রথমে অহর্যবংশ ও পরে শীশোদিয়া বংশে পরিণত হয়। শীশোদিয়া বংশের প্রথম পুরুষ বাপ্পারাওয়াল। তারপর থেকেই মেবারের রাণারা সিশোদিয়া-বংশীয় বলেই পরিচিতি লাভ করে।

কনক সেন লাহোর থেকে সৌরাষ্ট্র প্রদেশে চলে আসেন ১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। এবং সেখানে 'বীর নগর' নামে একটি নগরী স্থাপন করেন। তাঁর চার পুরুষ পরে বিজয় সেন নামে একজন পরাক্রমশালী রাজা বিজয়পুর, বিদর্ভ ও বল্লভীপুর নামে তিনটি নগরী স্থাপন করেন এবং নিজের রাজধানী সরিয়ে নিয়ে আসেন বল্লভীপুরে। বল্লভীপুর ভাওনগর বা ভগবান নগরের দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখন এ-নগরী

অত্যন্ত দুরাবস্থাতে পরিণত। তবুও পুরোণো মাহাত্ম্যের কিছু কিছু এখনো বর্তমান আছে। 'শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য' নামে একটি জৈন গ্রন্থে এই নগরী অতীতে কত সমৃদ্ধ ছিল সে কথা বলা আছে। অন্যান্য জৈনগ্রন্থে ও 'রাণা রাজসিংহের রাজত্ব বর্ণনা' নামক ইতিহাসে বল্লভীপুরের উল্লেখ আছে। জৈনগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ২০৫ বিক্রম শকে অথবা ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরী অসভ্যগণের দ্বারা আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়। কিন্তু সেই অসভ্যগণের অনেকেই সেই যুদ্ধে নিহত হয়। এবং অবশিষ্টগণ মন্দুর দেশে পালিয়ে গিয়ে সেখানে বল্লী, সন্দেশী ও নাদোল নামে তিনটি নগরী স্থাপন করে সেখানে বসবাস সুরু করে। পুরাতত্ত্বে বলা হয়েছে যে, এই সকল আক্রমণ-কারীরা সিথিক বংশ থেকে উৎপন্ন। এরা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথমে সিন্ধু প্রদেশে এসে যদুবংশীয় রাজাদের পরাস্ত করে সেখানে রাজ্য স্থাপন করে ও পরে অগ্রসর হতে হতে বল্লভীপুর অধিকার করে। পরে এই পথ ধরেই অসংখ্য আর্য-অনার্য জাতি ভারত-উপদ্বীপে এসে বসবাস সুরু করে। এই আসা-যাওয়ার স্রোত চলতে থাকে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত। এরা প্রথমে আসে উত্তর থেকে দক্ষিণে ও পরে পূর্বমুখে। এই ভাবে এরা পঞ্চনদ, সৈন্ধব, ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশকে প্লাবিত করে। এর প্রমাণ শুধু ভারত পুরাতত্ত্বে নয় পাশ্চাত্যের অনেক ইতিহাসেও পাওয়া যায়। এই সকল জাতির মধ্যে জিৎ, বাজেত্রী, শুণ, কমরী, কট্টী, বল্ল ও অশ্বরী প্রধান। কারো কারো মতে বল্লভী নগরী যারা আক্রমণ করে তারা সিথিক বংশীয় ছিল না। তারা ছিল শুণ বংশোদ্ভব। তাঁরা বলেন বল্লভীপুর বল্লভজাতীয় রাজারাই প্রতিষ্ঠা করেন। বল্লভজাতি সিথিক বংশেরই একটা শাখা। সুতরাং সিথিক জাতিরা নিজেদের স্বজাতি প্রতিষ্ঠিত রাজ্য আক্রমণ করবেন না। সিথিক বংশের লোকেরা সূর্য ও অগ্নির উপাসক ছিলেন। বল্লভীপুরের রাজারাও সূর্য ও অগ্নির উপাসক। এই বংশের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন শিলাদিত্য। শিলাদিত্য কোন এক যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর পত্নীগণ তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হলেন। কিন্তু রাজমহিষী পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন বলে সহমৃতা হতে পারেননি। সেই সময়ে তিনি রাজধানীতে ছিলেনও না। তিনি ছিলেন পিতৃগৃহে। শিলাদিত্যের মৃত্যু-সংবাদ শুনে তিনি রাজধানীতে ফিরে আসছিলেন। পথে একটি গুহার অভ্যন্তরে তিনি সন্তান প্রসব করেন। শত্রুরা যাতে তাঁর পুত্রকে হত্যা করতে না পারে, সেই কারণে তিনি বীরনগরে কমলাবতী নামে একজন ব্রাহ্মণপত্নীর হাতে তাঁর পুত্রের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার দিয়ে শত্রুদের হাতে পড়বার আগেই আত্মাহুতি দেন।

কমলাবতী বীরনগরীতে কোন এক দেবালয়ের সেবিকা ছিলেন। তিনি স্বয়ংও পুত্রবতী ছিলেন। তবুও রাণী পুষ্পবতীর পুত্রকেও নিজের পুত্রের

মত পালন করতে লাগলেন। গুহাজাত পুত্র বলে তিনি রাজকুমারের নাম রাখলেন 'গোহা'। উত্তরকালে এই 'গোহা'ই গোহাবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই গোহা বংশেই ক্রমে ক্রমে শব্দের বিবর্তনে গোহিলোট, পরে গেহিলোট এবং শেষে গিহেলাটে পরিণত হয়।

এই বীর নগরেও বাপ্পারাওলের জীবনহানীর আশঙ্কা দেখে কমলাবতী তাকে ভান্দীয়ার দুর্গে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সেখানেও তার জীবনহানীর আশঙ্কা অনুমান করে তাকে শেষে পরাশরারণ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই অরণ্যের মধ্যভাগে ত্রিকুট নামে এক পর্বত আছে। তার পাদদেশে নগেন্দ্র নামে এক নগরী ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন নগেন্দ্র এবং তাঁর নামেই সে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। গিরি-গুহাবেষ্টিত এই রাজ্যেই বাপ্পারাওলের শৈশব কাল অতিবাহিত হয়। এখানে প্রাচীন দেব-দেবীর অনেক মন্দির আছে। এখানকার অধিবাসীরা অতীতকাল থেকেই মহাদেব বা একলিঙ্গের উপাসক। গিহেলাট বংশের রাজারাও এই একলিঙ্গের পূজারী। চিতোর গড়ের বাপ্পারাওল থেকে সুরু করে সকল রাজারাই শৈব। শিবের উপাসক। মহারাণারা একলিঙ্গকে নিজেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলে মনে করেন। আর নিজেদের মনে করেন ঐ দেবতার প্রতিনিধি বা দেওয়ান।

বাপ্পারাওল সম্পর্কে নানা গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায়, গিরি-গুহা-বেষ্টিত ঐ নগেন্দ্র নগরে বাপ্পারাওল ছেলেবেলায় গোরু চরাতেন। একদিন তিনি মাঠে গোরু ছেড়ে দিয়ে এক নিকুঞ্জ বনে বসে আছেন। এমন সময় সোলাঙ্কি বংশের নগদা-রাজ্যের রাজার মেয়ে তার সঙ্গিনীদের নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। সেদিন ছিল ঝুলন উৎসবের দিন। নগদা-রাজ্যের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সেইদিন স্ত্রী-পুরুষ একত্রে ঝুলনে ঝুলতে হয়। কিন্তু সেই সোলাঙ্কি কন্যা ও তার সখীবৃন্দ ঝুলনের দড়ি সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। সুতরাং তারা বাপ্পারাওলয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে একটা বড় দড়ি এনে দিতে অনুরোধ জানাল। বাপ্পারাওল প্রথমে রাজী হলেন না। পরে অনেক অনুনয়ের পর একটি সর্তে রাজী হলেন। তাঁর সর্ত হল আগে খেলার মাধ্যমে একটা বিবাহ-অনুষ্ঠান পালন করা হবে। পরে ঝুলন যাত্রা। সোলাঙ্কি-কন্যা ও তার সখিবৃন্দ রাজী হয়ে গেল। কারণ এতে তাদের ঝুলনযাত্রার যে ইচ্ছা, সেটা ফলবতী হবে। ফলে ঐ নিকুঞ্জবনে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান পালন করা হল। বিবাহ অনুষ্ঠানে বাপ্পারাওল নায়ক ও সোলাঙ্কি কন্যা নায়িকা সাজলেন এবং তার সঙ্গিনীগণ সখী। নায়িকার সখীরা সোলাঙ্কি কন্যার আঁচলের সঙ্গে নায়কের উত্তরীয় বেঁধে দিলেন। এবং দুজনকে হাতে হাতে বেঁধে একটা গাছের নীচে দাঁড় করালেন। তারপর দুজনে একত্রে সেই গাছটাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলেন। এইভাবে

একপ্রকার শাস্ত্র মতেই তাঁদের বিবাহের কাজ শেষ হল। সেইদিন সেই সোলাঙ্কি-কন্যা বাপ্পারাওলয়ের এক রকম স্ত্রী বলেই গণ্য হল।

কিন্তু এই ঘটনার পর বাপ্পারাওলয়ের মনে হল তাঁকে এবারে হত্যা করবার একটা চেষ্টা হতে পারে। নগদা-রাজ্যের রাজার কানে যদি এ-খবর যায় তবে তিনি বাপ্পারাওলকে খুঁজে বার করবেন এবং উচিত মত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। এ-কথা মনে হতেই বাপ্পারাওল নগদা রাজ্য ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। এবং এই পলায়নই তাঁর উত্তর জীবনে তাঁকে কীর্তিমান হতে সাহায্য করল।

তিনি পালিয়ে যাবার কিছুদিন পরেই সোলাঙ্কি-কন্যার এক রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব এল। সেই উপলক্ষ্যে সোলাঙ্কি রাজার কুল পুরোহিত রাজকন্যার হাতের রেখা বিচার করতে বসলেন। এবং দীর্ঘ সময় হাতের রেখা বিচার করে বললেন যে,রাজনন্দিনীর বিবাহ আগেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। কুল-পুরোহিতের কথা শুনে রাজপরিবারের লোকেরা অবাক। তাঁরা এমন একটা ঘটনা শোনবার জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। তখন নগদা-রাজ্যের রাজা সমস্ত ঘটনা জানবার জন্যে কিছু গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই গুপ্তচরেরা যথাযত খবর নিয়ে এল। কবে বিবাহ-কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কোথায় হয়েছে। এবং এ-বিবাহ সভায় কারা উপস্থিত ছিল। ফলে সমস্ত ঘটনাই সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল। এবং রাজ পরিবারে এক অশান্তি ঘনিয়ে এল।

সোলাঙ্কি রাজ শেষে বাপ্পারাওলকে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্যে লোক লাগালেন তাকে ধরে রাজসভায় আনবার জন্যে। বাপ্পারাওল সে খবর জানতে পেরে দু'জন বিশ্বস্ত ভিল্‌কে নিয়ে সেই রাজ্য ত্যাগ করে আরো গভীর বনে গিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন। তাঁর দিন খুবই কষ্টে কাটতে লাগলো। যে দুজন ভিল্‌ এই গোপন খবর দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন তাদের একজনের নাম বালেয়ো ও অপর জনের নাম দেবা। বালেয়ো একজন গুহাবাসী ও দেবা সোলাঙ্কি-বংশীয়। উত্তরকালে মোরি-বংশীয় রাজার কাছ থেকে রাজত্ব কেড়ে নিয়ে বাপ্পারাওল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন এই বালেয়ো-ই তার নিজের আঙ্গুল কেটে রক্ত দিয়ে বাপ্পারাওলয়ের কপালে রাজটীকা পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কারণে চিতোরের মহারাণার বংশধরগণ অভিষেককালে রাজললাটে রাজটীকা ধারণের অধিকার দীর্ঘদিন ভোগ করে এসেছেন।

বাপ্পারাওল যখন গভীর বনে আত্মগোপন করে কাটাচ্ছিলেন তখন তাঁকে একটা অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। এবং এই অলৌকিক ঘটনাই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে সম্ভাবনাময় করে তোলে। নিভৃত-বাসকালে

বাপ্পারাওল প্রতিদিন গোরু চরাতে যেতেন এবং সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন। ঘরে ফিরে এলে গৃহস্বামী গোরু দোহন করে একটুও দুধ পেতেন না। গৃহস্বামী ভাবলেন বাপ্পারাওল প্রতিদিন গোরু ঘরে আনবার আগে দোহন করে খেয়ে নিচ্ছে। তিনি এই ধারণার বশবর্তী হলেন বটে তবে বাপ্পারাওলকে মুখে কিছু বললেন না। পরে একদিন থাকতে না পেরে তিনি তাঁর সন্দেহের কথা বাপ্পারাওলকে জানালেন। বাপ্পারাওল এই দোষারোপে রেগে আগুন হলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তিনি গোপনে অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। এবং শেষে অনুসন্ধানে জানতে পারলেন যে, এ-সন্দেহ একটুও অমূলক নয়। কারণ তিনি দেখলেন যে, দুগ্ধবতী গাভী প্রতিদিনই সন্ধ্যায় দুধ-শূন্য অবস্থায় বাড়ী ফিরে আসছে। তিনি অবাক হলেন এবং সেইদিন থেকে গাভীর চলাফেরার প্রতি নজর রাখতে লাগলেন। একদিন তিনি দেখলেন যে, ঐ অলৌকিক ধেনু কোন একটি গুহামধ্যে প্রবেশ করে একটি কুঞ্জের কাছে নিজেই স্বতস্ফূর্তভাবে নিজের দুধ ঝরিয়ে দিচ্ছে। এবং সেই কুঞ্জেরই পাশে একজন মহাপুরুষ আপন মনে ধ্যানস্থ আছেন। অবস্থা দেখে বাপ্পারাওল অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন। বাপ্পারাওল তখন নানাভাবে ঐ মহাপুরুষের ধ্যান ভাঙ্গাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনভাবেই সফল হতে না পেরে শেষে এক বিরাট চীৎকার করে উঠলেন। ফল ভালই হল। মহাপুরুষের ধ্যান ভাঙলো। তখন বাপ্পারাওল সেই মহাপুরুষকে স্তব-স্তুতি করে জানতে পারলেন যে, এই মহাপুরুষই হচ্ছেন প্রজাপতি হারিত। তিনি এতদিন এখানে আত্মগোপন অবস্থায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন।

প্রজাপতি হারিত বাপ্পারাওলের পরিচয় জানতে চাইলেন। বাপ্পারাওল তাঁর নিজের পরিচয় যতদূর জানা ছিল জানালেন। এবং তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। প্রজাপতি হারিত অত্যন্ত খুসী হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

প্রজাপতি হারিতের সঙ্গে বাপ্পারাওলের যোগাযোগের সূচনা এই-ভাবেই। তারপর বাপ্পারাওল প্রায় প্রতিদিনই সেখানে এসে বসতেন। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রজাপতি হারিতকে প্রণাম জানাতেন এবং পর্যাপ্ত দুধ দোহন করে তাঁর সেবার জন্যে দিতেন। প্রজাপতি হারিতও বাপ্পারাওলের ব্যবহারে অত্যন্ত খুসী হয়ে তাঁকে ধর্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে নানা উপদেশ দিতেন। দিনে দিনে তাঁদের সম্পর্কও ঘনিষ্ট হতে লাগলো। শেষে একদিন প্রজাপতি হারিত নিজে বাপ্পারাওলের ললাটে ত্রিপুণ্ডক-টীকা প্রদান করে তাঁকে শৈব-ধর্মের গূঢ়তত্ত্বে দীক্ষা দিলেন। এবং তাঁকে ভগবান একলিঙ্গের প্রতিনিধি বা দেওয়ান পদে অভিষিক্ত

করলেন। উত্তর কালে মেবারের সমস্ত রাণারাই বাপ্পারাওলের বংশধর হওয়ার ফলে তাঁরা সকলেই একলিঙ্গের পূজারী ছিলেন এবং একলিঙ্গের প্রতিনিধি বা দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হতেন। বাপ্পারাওলের জীবনের শুভ সূচনা এখানেই শেষ নয়। এরপরও তিনি একলিঙ্গের পূজা করে এবং প্রজাপতি হারিতের সেবার মাধ্যমে সিংহ-বাহিনী ভবানীর দর্শন লাভ করেছিলেন। শোনা যায় দেবী স্বহস্তে বাপ্পারাওলকে বিশ্বকর্মা নির্মিত এক অপূর্ব কুণ্ডক উপহার দিয়েছিলেন। সেই কুণ্ডক চিতোর গড়ে রাণা বংশে পুরুষানুক্রমে বিদ্যমান ছিল। লোকে বলে অত সুন্দর কুণ্ডক পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়নি। শোনাযায় মা ভবানী নিজে হাতে তাঁকে নানা অস্ত্রে বিভূষিত করে দিয়েছিলেন। এবং তার বিনিময়ে বাপ্পারাওলের কাছ থেকে শুধুমাত্র ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দাবী করেছিলেন। প্রজাপতি হারিতও সেইস্থান ত্যাগের পূর্বে বাপ্পারাওলকে নানাভাবে আশীর্বাদ করেছিলেন।

বাপ্পারাওল আগেই তাঁর পরিচারিকার মুখে শুনেছিলেন যে, তিনি মোরী বংশের ভাগ্নে। এখন তিনি দৈব বলে বলীয়ান হয়ে কিছু সহচর সঙ্গে নিয়ে অরণ্য প্রদেশের গুপ্ত স্থান ত্যাগ করে সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। অরণ্যপ্রদেশ ত্যাগ করে যাবার সময় ত্রিগড় পাহাড়ে মহর্ষি গোরক্ষানাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির পাদপদ্মে ভক্তি ভরে প্রণাম জানান। মহর্ষি তাঁর ভক্তিতে প্রীত হয়ে একখানা দ্বি-ফলক খড়্গ উপহার দেন। বাপ্পারাওল সেই মন্ত্রপূত খড়্গ, মা ভবানীর অস্ত্র এবং প্রজাপতি হারিতের আশীর্বাদি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজের সহচরদের সঙ্গে নিয়ে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

বাপ্পারাওল চিতোর গড়ের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা। একথা আগেও বলা হয়েছে। বাপ্পারাওলের বংশ থেকে চিতোর রাণা বংশের সূত্রপাত। এবং চিতোরের রাণারা যে পুরুষানুক্রমে শৈব, শক্তির সাধক এবং একলিঙ্গের পূজারী, এর সূচনা বাপ্পারাওলের কাল থেকেই। বাপ্পারাওলই রাণা বংশের উত্তর পুরুষ। সেই কারণে চিতোরের পরবর্তী রাণাদের জীবনী এখানে সংক্ষেপে পরিবেশিত হলেও বাপ্পারাওলের অলৌকিক জীবন-কথা মোটামুটি বিশদভাবেই তুলে ধরা হল। কারণ চিতোর গড়ের বিশদ বিবরণের সঙ্গে চিতোর গড়ের প্রতিষ্ঠাতা বাপ্পারাওলের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে।

যাইহোক তখন চিতোর গড়ে রাজত্ব করতেন মোরী-বংশীয় রাজারা। বাপ্পারাওল যে মোরী-বংশের ভাগ্নে একথা তিনি জানতেন এবং একথা আগেও বলা হয়েছে।

তিনি সদলবলে চিতোর গড়ে এসে মোরী-বংশীয় রাজাকে নিজের পরিচয় প্রদান করলেন। মোরী-বংশীয় রাজা বাপ্পারাওলের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে এবং গোপনে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে, সত্যই মোরী-রাজার ভাগ্নে। তখন রাজা বাপ্পারাওলকে নিজের সামন্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর ব্যয় বহনের জন্যে একটা জমিদারী প্রদান করলেন। মেবারে তখন সামন্ত্র-তন্ত্র-রাজ্য-প্রণালী প্রচলিত ছিল। ফলে মোরী রাজ অসংখ্য সামন্ত-বর্গে পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য সাহায্য করবার সর্তে এক একটি জমিদারী বা জায়গীর ভোগ করতেন! বাপ্পারাওল অত্যন্ত সৎচরিত্র, বীর, ও দৈব শক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। বাপ্পারাওল অন্যান্য সামন্তদের চেয়ে যথেষ্ট-ভাবে ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ার ফলে অল্পদিনেই রাজার অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। রাজার বাপ্পারাওলের প্রতি এই ধরনের অনুগ্রহ দেখে অনেক সামন্ত, রাজার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁরা রাজাকে আর সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন না। ঠিক এমন সময় মোরী রাজ্য এক বৈদেশিক শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হল। মোরী-রাজ যথা নিয়মে তাঁর সামন্ত-বর্গকে যুদ্ধের জন্যে সৈন্য দিতে আদেশ করলেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট সামন্ত-বর্গ তাঁর আদেশ পালন করলেন না। বরং প্রত্যেকেই তাঁদের জায়গীর মোরীরাজকে ফিরিয়ে দিলেন। এবং বলে পাঠালেন যে, নবাগত সামন্ত-যুবকের প্রতি তাঁর যখন এতই অনুগ্রহ তখন তাঁকেই যুদ্ধে প্রেরণ করা হোক।

সামন্ত-বর্গের এই ধরনের বিরূপ মনোভাব দেখে মোরীরাজ তাঁদের জায়গীর থেকে বঞ্চিত করলেন এবং বাপ্পারাওলকে সেনাপতি পদে বরণ করে যুদ্ধে পাঠালেন। তখন সামন্ত বর্গ নিজেরাই লজ্জিত হয়ে যুদ্ধে গেলেন। বাপ্পারাওল এইসব সামন্তদের ওপর নির্ভর না করে নিজের চেষ্টায় ও বীরত্বে শত্রুকে পরাস্ত করে মোরী-রাজকে রক্ষা করলেন।

কিন্তু বাপ্পারাওল শত্রু দমন করে চিতোরে ফিরে এলেন না। তিনি আরো উৎসাহিত হয়ে সৈন্যদের নিয়ে নিজের পিতৃপুরুষের রাজধানী গজনীতে যাত্রা করলেন। তখন গজনীতে সেলিম নামে একজন মুসলমান রাজত্ব করছিলেন। বাপ্পারাওল তাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সেখানে একজন ক্ষত্রিয়কে বসিয়ে চিতোরে ফিরে এলেন। এদিকে সামন্ত-বর্গেরা মোরীরাজের নিকট উপযুক্ত সম্মান না পেয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হয়ে চিতোর ছেড়ে চলে গেলেন। মোরীরাজ অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শেষে তাঁদের ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা ফিরে আসতে অস্বীকার করলেন। এবং বলে পাঠালেন যে, তাঁরা এ অপমানের প্রতিশোধ

নেবেন। এদিকে সামন্ত-বর্গেরা বাপ্পারাওলের শৌর্যবীর্য বীরত্ব ও উদারতা দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা একত্রে আলাপ-আলোচনা করে বাপ্পারাওলকে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসাবার এক প্রস্তাব পাঠালেন। বাপ্পারাওল দেখলেন যে, চিতোরের সিংহাসনে বসবার এই একটা সুযোগ। তিনি মোরীরাজার প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও সে কথা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে এবং মোরীরাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। তখন সমস্ত সামন্ত-বর্গ বাপ্পারাওলকে আবার সেনাপতি পদে বরণ করে চিতোর আক্রমণ করলেন।

অতীতে সামন্ত্র-তন্ত্র চালু থাকার জন্যে সামন্তেরা সৈন্য-সাহায্য না করলে রাজাকে যুদ্ধ পরিচালনা করা কোন মতেই সম্ভব হত না। তখন সমস্ত সামন্তদের সৈন্য সাহায্যই ছিল রাজার বল। সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও সেই ফল ফললো। মোরীরাজ সহজেই পরাজিত হলেন এবং চিতোর বাপ্পারাওলের হাতে এল।

বাপ্পারাওল শিসোদিয়া বংশের আদিপুরুষ। এবং প্রায় একশো রাণার আদিপুরুষ। শোনাযায় বাপ্পার অসংখ্য পুত্র-সন্তান জন্মেছিল। এবং উত্তরকালে তারা নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। জীবনের শেষের দিকে তিনি তাঁর বিজয়ী সেনাদের নিয়ে প্রতীচ্যদেশ অধিকার করতে গিয়েছিলেন। তিনি সেকেন্দর শাহের মত প্রতীচ্য সকল দেশ জয় করতে করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এবং রাজ্যচ্যুত সকল মুসলমান রাজার কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন। এইসব মুসলমান কন্যাদের গর্ভে ও বাপ্পারাওলের ঔরসে অসংখ্য সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেছিল। বাপ্পারাওল এই দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে আর চিতোরে ফিরে আসেননি। শোনা যায় তিনি তুরস্ক প্রদেশ জয় করে সেখানেই দেহত্যাগ করেন।

মেবারের একটা প্রাচীন ইতিহাসে বলা হয়েছে যে, বাপ্পারাওল ইস্পাহান, গান্ধার, কাশ্মীর, ইরান, ইরাক, তুরান ইত্যাদি সকল রাজ্য জয় করে সেইসব রাজ্যের রাজাদের কন্যাগণকে বিবাহ করেছিলেন। সেইসব স্ত্রীর গর্ভে তাঁর মোট ১৩০টি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। উত্তর কালে এইসব পুত্রেরা তাদের মায়ের নামে এক একটি জাতি প্রতিষ্ঠা করে। এদের বলা হয় 'নশেরা পাঠান'। আবার অন্যদিকে বাপ্পারাওলের হিন্দু স্ত্রীদের গর্ভে মোট পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে ২০০। তারা উত্তর কালে 'অগ্নি উপাসী সূর্যবংশী' নামে পরিচিত হয়।

বাপ্পারাওল মৃত্যুর আগে মেরুপর্বতের পাদমূলে সমাধিস্থ হন এবং মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত প্রজাদের মধ্যে ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে মৃতদেহ নিয়ে প্রবল ঝগড়া সৃষ্টি হয়। মুসলমান প্রজারা ও সন্তানেরা

বাপ্পারাওলের মৃতদেহকে কবর দিতে চায় এবং হিন্দু প্রজারা সন্তানেরা চায় পুড়িয়ে দিতে। যখন এই ঘটনা একটা আন্দোলনের রূপ নিল তখন একজন হিন্দু প্রজা বাপ্পারাওলের মৃতদেহের বস্ত্র সরিয়ে দেখলো যে সেখানে আর কোন মৃতদেহ নেই। সেখানে অসংখ্য পদ্মফুল পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে সকলেই অবাক। তখন তাদের বিবাদ মিটে গেল। তখন তারা সেই সব পদ্মের বীজ নিয়ে সামনের হ্রদে ফেলে দিল। পরে এইসব বীজ থেকে সেই হ্রদে অসংখ্য পদ্মফুলের গাছ উৎপন্ন হয়েছিল।

বাপ্পারাওল জন্মগ্রহণ করেন ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং চিতোরের সিংহাসনে বসেন ৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।

বাপ্পারাওলের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরগণ অবিচ্ছিন্নভাবে ১১ শতাব্দী ধরে চিতোরে রাজত্ব করে এসেছেন। কোনদেশে বা কোন রাজবংশের ভাগ্যে, গৌরবের সঙ্গে এত দীর্ঘকাল রাজত্বের কথা শোনা যায় না।

ধর্মের-ঔদার্যে বাপ্পারাওল একদিক থেকে আকবরের চেয়েও বড়। আকবর রাজপুত কন্যাদের বিবাহ করেছিলেন বটে তবে তাদের পুত্রদের দিল্লীর সাম্রাজ্য দিতে পারেননি। কিন্তু বাপ্পারাওল তাঁর মুসলমান পুত্রদের ভারতের বাইরের সকল রাজ্যই দিয়ে গিয়েছিলেন।

বাপ্পারাওল সম্পর্কে এত কথা বলার কারণ, বাপ্পারাওল শিসোদিয়া বংশের এবং চিতোর গড়ের প্রতিষ্ঠাতা। বাপ্পারাওলের আগে চিতোর গড়ের নাম ডাক, খ্যাতি ইত্যাদি কিছুই ছিল না। আগেই বলা হয়েছে যে, সেখানে মোরীরাজ রাজত্ব করতেন। চিতোর গড়ের খ্যাতি প্রতিপত্তি সুরু বাপ্পারাওলের আমল থেকে। সেই কারণেই বাপ্পারাওলের জীবনের মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখানে জানানো হল। চিতোর গড়ের ইতিহাসে, বাপ্পারাওলের জীবনী যদিও আপাতঃ-দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রয়োজন। তবে চিতোর গড়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে যত বিশদ বিবরণ দেওয়া হল এর পরবর্তী রাণাদের ইতিহাস এত বিশদভাবে আলোচনা করা হবে না। সে ইতিহাস হবে সংক্ষিপ্ত।

কিন্তু বাপ্পারাওলের মতই চিতোর গড়ে শেষ যুগে যাঁরা রাজত্ব করে গেছেন তাঁদের ইতিহাস মোটামুটিভাবে বিস্তারিত করা হবে। যেমন উদয় সিংহ, প্রতাপ সিংহ, অমর সিংহ এবং রাজসিংহ। কারণ চিতোর গড় পত্তনের সুরুতে বীর হাম্বীর, চুণ্ডা, রাণাকুম্ভ, মহারাণা সংগ্রামসিংহ যে বীরত্ব, বিক্রম ও তেজ দেখিয়েছিলেন, সেই বীরত্ব, বিক্রম এবং তেজ দেখিয়েছিলেন উদয়সিংহ, প্রতাপসিংহ, অমরসিংহ এবং রাজসিংহ। কিন্তু তখন চিতোর গড়ের পড়তি অবস্থা। একদিকে মোগল শক্তি বার বার চিতোর গড় আক্রমণ করে চলেছে। এ আক্রমণের সুরু বাবর থেকে। এবং

মোটামুটিভাবে শেষ ঔরঙ্গজেবের পরবর্তী যুগে। এই দীর্ঘকাল মোগলদের আক্রমণকে প্রতিহত করে চিতোর গড়কে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। শেষ যুগে আসছে মারাঠা শক্তি, শিখ এবং সব শেষে ইংরেজ।

ইংরেজের সঙ্গে রাজপুত রাণাদের সন্ধি হয় দিল্লীতে। ১৮১৮ সালে জানুয়ারী মাসে। সেটা চিতোর গড়ের ইতিহাসের শেষ যুগ। এই শেষ যুগে চিতোর গড়কে রক্ষা করেছিলেন উদয় সিংহ, মহারাণা প্রতাপ সিংহ, অমর সিংহ এবং রাজসিংহ। এ যুগ ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির পূর্ব যুগ। অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহের যুগ। চিতোর গড়ের ইতিহাসে আদিকাল এবং শেষ কালই বীরত্বের কাল। এবং মাঝের যুগ শুধু মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ এবং পরাজয়ের যুগ। রাণারা কেউ তেমন তেজ বা বিক্রম প্রকাশ করতে পারেননি। সে যুগ ভোগ-বিলাসের আর রাজপুতানীদের 'জহরব্রত' পালনের যুগ।

* * * * *

চিতোর গড়ের সব চেয়ে আশ্চর্য আকর্ষণ হচ্ছে রাণা কুম্ভের প্রাসাদ। তিনি নিজে এই প্রাসাদ নানা কারুকার্য-মন্ডিত করে তৈরী করান। এ প্রাসাদের মূল পরিকল্পনা ও স্থপতিবিদ্যা তাঁর নিজের। তিনি একজন নামী শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, ঐতিহাসিক এবং স্থপতিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর লেখা অনেক বই এবং গানও আছে। আজ মীরাবাঈ-এর গান সকল সম্প্রদায় ও লোকের মুখে মুখে। কিন্তু মীরাবাঈ-এর ও আগে রাণা কুম্ভ চিতোর গড়ে গান লিখে গেছেন। সে গানের ভাব, ভাষা ও ব্যঞ্জনা অনেকটা মীরাবাঈ-এর গানের মত।

রাণা কুম্ভের রাজপ্রাসাদের এলাকা বিরাট। এই প্রাসাদের চার দেওয়ালে রাজপুত পুরুষদের বীরত্বের ইতিহাস গাঁথা আছে। এই প্রাসাদে প্রবেশের জন্যে তিনটে তোরণ আছে। সমস্ত মহিলা মহলের সঙ্গে যুক্ত একটি হলঘর। রাণাকুম্ভ এই হলঘরে সভা ডাকতেন। রাণা প্রতাপ এই প্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রাসাদের নীচ দিয়ে একটা গোপন সুড়ঙ্গ পথ গোমুখ নদীতে গিয়ে পড়েছে। শোনা যায় এই পথ ধরে রাণাকুম্ভ প্রতিদিন স্নানে যেতেন। পরবর্তী কালে এই প্রাসাদেই মেয়েরা 'জহর ব্রত' পালন করতেন। রাণা কুম্ভ ছিলেন রাণা মুকুলের পুত্র। তিনি তাঁর প্রাসাদ তৈরী করেন 1433 A.D-তে। তিনি যে শুধু শিল্প, সংগীত ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সংগীত সম্বন্ধীয় কিছু রচনা করেছিলেন সেটাই বড় কথা নয়। তিনি একজন নামী যোদ্ধাও ছিলেন। সুলতান মামুদ খিলজীকে তিনি 1437 A.D-তে পরাজিত করেন এবং এই জয়ের স্মরণে তিনি এখানে এক "জয়স্তম্ভ" তৈরী করেন।

Famous historian Col. Todd describes him thus :

"Kumbha had occupied the throne for a half a century, he had triumped over the enemies of his race, fortified his country with strongholds embellished it with the superstructure of her fame, had laid the foundation of his own when the year which should have been Jubilee was disgraced by the foulest blot in the annals and his life, which nature was about to close, terminated by poniard of an assassin, that assassin his own son."

আলাউদ্দীন খিলজী 1303 A.D.-তে বার বার চিতোর আক্রমণ করে এবং এই গড়ের সমস্ত মন্দির ও মসজিদ নষ্ট করে দেয়। সেই সময় এই প্রাসাদেরও প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি হয়।

তিনি যে জয়স্তম্ভ তৈরী করেছিলেন তাকে বলা হয় 'The Tower of Victory'. মীরাবাঈ-এর মন্দিরের পশ্চিমে পাহাড়ের ওপর এই বিরাট 'জয়স্তম্ভ' স্থাপিত। Col. Todd এই জয়স্তম্ভকে মোটামুটিভাবে দিল্লীর কুতবমিনারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই স্তম্ভ ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার এক অপূর্ব নিদর্শনও বটে। ভারতের প্রতিটি ধর্মের প্রতীক এতে দেওয়া আছে। এই স্তম্ভের উচ্চতা ১২০ ফুট। ভূমিতে এর পরিধি ৩০ ফুট। সিঁড়ি ১৫৭টি। এই স্তম্ভ তৈরী করতে ৯০ লাখ টাকা খরচ হয় এবং সময় লাগে ৭ বৎসর। নীচের পরিধি ৪৭ বর্গ ফুট। উচ্চতা ১০ ফুট। এই স্তম্ভের Chief architect and designer ছিলেন রাণা লাক্ষার পুত্র সূত্রধর জৈতা।

* * * * *

বীর হাম্বীর একজন যুদ্ধবিদ রাণা। তিনি জীবনে মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মতই অনেকবার যুদ্ধ করেছিলেন। বীর হাম্বীর দিল্লীর মহম্মদ তুঘলককে পরাজিত করে মেওয়ার, আজমীর, রণথম্ভোর ইত্যাদি দখল করেন। সেখান থেকে তিনি ৫০ লাখ টাকা ও ১০০টা হাতী নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর সুনাম রক্ষা করেই মারা যান। তাঁর সময়ে শুধু যে তাঁর রাজ্যই সমৃদ্ধ ছিল তা নয় তাঁর প্রজারাও সুখে ছিল। এখনো চিতোর গড়ে তাঁর গৌরবের অনেক পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়।

* * * * *

কিন্তু এমন চিতোর গড়ও একদিন আকবরের হাতে চলে গিয়েছিল। তার একমাত্র কারণ হিন্দু সাম্রাজ্যের দুর্বলতা। চিতোর গড়ের অনন্তরত্ন ভাণ্ডার বার বার বিদেশী লুণ্ঠনকারীরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। এবং

বার বার আক্রান্ত হয়েছে। তার একমাত্র কারণ সামন্ত-তন্ত্র। এইসব সামন্তেরা কোনদিনও সংহত বা কেন্দ্রীভূত ছিল না। এদের শক্তি ছিল ছড়ানো। রাজা মহারাণাকে সামন্তেরা সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে জায়গীর ভোগ করতো। কোন বিদেশী শক্তির আক্রমণের সময় যদি এইসব সামন্তেরা সৈন্য দিয়ে সাহায্য না করে তবে রাজা বা রাণা উপায়হীন হয়ে পড়ে এবং তাঁর পরাজয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীকরণ শাসন প্রণালীর অভাবই বার বার বহিঃশত্রুর আক্রমণের পথকে সুগম করে দিয়েছে। চিতোর গড়ের আক্রমণেও ঐ একই কথা। যে সময়ে সেকেন্দর শাহ ভারত আক্রমণ করে সেই সময়েও ভারতের রাজশক্তির এই একই অবস্থা ছিল। তখন এক পঞ্চনদ প্রদেশই অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এবং প্রত্যেকটি রাজ্য এক একজন রাজার অধীনে ছিল। এ ছাড়াও সেখানে অনেক নাগরিক সমাজ ছোট ছোট সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের জাহির করবার একটা চেষ্টা চালাতো। কেন্দ্রীকরণ শাসন প্রণালী না থাকার জন্যে বহিঃশত্রু অনায়াসেই আক্রমণ করে বসতো এবং লুণ্ঠন চালাতো। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাইরের কত শত্রু যে ভারতের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তার হিসেব করা যাবে না।

সেকেন্দর শাহের আগেও পারসীকরা ভারত আক্রমণ করে। পারসীকদের পর আসে গ্রীকেরা। তারপর পার্থীয়ানেরা। পার্থীয়ানের পর গেটেস্। ইতিহাস ও বিভিন্ন মুদ্রাই এই আক্রমণের প্রমাণ। কিন্তু বিচিত্র এমন যে এরা কেউ ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য গড়তে পারেনি। ঘোরী-বংশীয় সাহাবুদ্দীনই ইন্দ্রপ্রস্থে সর্বপ্রথম স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। তাঁর সময় থেকে চেঙ্গীশ খাঁর বংশ-সম্ভূত বাবরের কাল পর্যন্ত এই তিনশো শতাব্দীর মধ্যে পাঁচ বার ভারত আক্রান্ত হয় ও অধিকৃত হয়। প্রতিবারই এক একজন মুসলমান নতুন নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরে তা আবার লুপ্ত হয়। চিতোরের মহারাণা সংগ্রাম সিংহের রাজত্বকালে বাবর ভারত আক্রমণ করে। ভারতেই মোগলবংশের রাজশক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং শেষে বিলীন। কারণ এর পর এই রাজশক্তিকে পরাস্ত এবং গ্রাস করবার জন্যে চারিটি রাজশক্তি ক্রমে ক্রমে জেগে উঠতে লাগলো। প্রথমতঃ, মেবারের রাজপুত শক্তি। দ্বিতীয়তঃ, দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রীয় শক্তি। তৃতীয়তঃ, পঞ্চনদে শিখ শক্তি এবং চতুর্থতঃ, অনুগাঙ্গ প্রদেশে ব্রিটন্ শক্তি। প্রথম তিনটে শক্তি মোগলশক্তিকে বিপর্যস্থ করবার পর ব্রিটনশক্তি এই মোগল শক্তিকে একেবারে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হল। কত ধর্মবিপ্লব এবং কত রাজ্য বিপ্লব এই সময়ের মধ্যে চলে গেছে কিন্তু বিচিত্র এই যে, মেবারের রাজপুতগণ নিজেদের ধর্ম, কর্ম,

সভ্যতা ও বিশ্বাস থেকে একটুও বিচ্যুত হয়নি। অতীত আর্য সভ্যতা ও ধর্ম বিশ্বাস তাঁদের মধ্যে চিরকালই অটল ছিল।

রাষ্ট্রবিপ্লবে চিতোর গড়ে প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। মহাকাল তার প্রাপ্য আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু তবুও পুরুষানুক্রমে ধর্মসংস্কার, বিশ্বাস, সভ্যতা, চিন্তা-ভাবনা ও উৎসব-অনুষ্ঠান একই আছে। এখানে এলে মনে হবে অন্য দেশের সঙ্গে এই গড়ের কোন সম্পর্ক নেই। চিতোর গড়ের সুরুতে যে চেতা, যে বিশ্বাসে এরা রাজত্ব সুরু করেছিল, তিনশো বছর পরেও সে বিশ্বাস অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ ব্যাপারে এরা স্থিতিশীল। তবে স্থিতিশীল হলেও কিন্তু শক্তিহীন নয়। রাজপুত জাতির মধ্যে এক বিরাট শক্তি নিহিত ছিল এবং এখনও আছে। কর্তব্য-প্রিয়তা রাজপুত জাতির এক প্রধান ধর্ম। এরা যদি কাজকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করে তবে সেই কাজের জন্যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অকাতরে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এই চিন্তা-ভাবনা এদের মনে একেবারে বদ্ধমূল।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহ-ই চিতোরের শেষ হিন্দুরাজা। তাঁর সময়ে চিতোর গড় শৌর্যে, বীর্যে ও উন্নতির চরম সীমায় উঠেছিল। তিনি তাঁর রাজত্ব সুরু করেন 1508 A.D.-তে। চিতোর গড়কে সামলাবার জন্যে সারা জীবনে তাঁকে আঠারো বার যুদ্ধ করতে হয়। তিনি বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরে মারা যান। তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন বিদেশী লেখক বলেছেন ঃ

"Eighty thousand horses, seven Rajas, of the highest rank, nine Raos and one hundred and four chieftains, bearing the titles of Rawal and Rawat, with five hundred war Elephants followed Rana Sanga into the field. The Princes of Marwor and Ambor did him homage and the Raos of Gwalior, Ajmer, Sikri, Raesen, Kalpee, Chanderi, Boodi, Gugrown, Rampoora and Abu served him as tributories or held him in high honour. In short space of time, Sanga entirely allayed the disordered occasioned by the intestine fends of his family."

"Sanga organised his force, with which he always kept the field and ere he called to contend with the descendant of Temoor, he had gained eighteen pitched battles against the kings of Delhi and Malwa. In two of these he was opposed by Ibrahim Lodi in person at Bakrole and

Ghatolli, in which last battle the imperial forces were defeated with great Slaughter, leaving a prisoner of the Royal blood to grace the triumph of Cheetore. The Peela Khal (yellow rivulet) near Biana, became the Northern boundary of Mewar ; with the Sindu-river to the East—touching Malwa to the South, while his native hills were an inpenetrable barrier to the west."

"In short, Sanga was gradually ascending the pinnacle of destination with a bigger kingdom to rule and with the loyal support of Rajput confederacy, of which he was the undisputed leader and had not fresh hordes of Usbecs and Tarttara from the prolific Shores of the Oxus and Jaxertes again poured down on the plains of Hindusthan, the crown of the chacraverta might again have encircled the brow of Hindu and the banner of supremacy been transferred from Indraprastha to the battlement of Cheetore. But Babor arrived of a critical time to rally the dejected followers of the Koran and to collect them around his own Victorious Standard."

ওপরের মন্তব্য থেকে মহারাণা সংগ্রাম সিংহের রাজত্বকালের মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যায়।

তাঁর শাসন ব্যবস্থার একটা রূপরেখা জানবার জন্যে নীচে তাঁর লেখা একটি পত্রের নকল দেওয়া হল।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহ কর্তৃক তদীয় ভাগিনেয় জয়পুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মধুসিংহকে ভূ-বৃত্তি দানপত্র ঃ

শ্রীরামো জয়তি

শ্রীগণেশ প্রসাদতু শ্রীএকলিঙ্গ প্রসাদতু

মহারাজাধিরাজ মহারাণা সংগ্রাম সিংহ আদেশ করিতেছেন—
আমার ভাগিনেয় কুমার মধুসিংহকে গ্রাম প্রদান করা গেল—
রামপুরা প্রদেশের পাট্টা।

অতএব এক সহস্র অশ্বারোহী এবং দুই সহস্র পদাতীসহ তুমি বার্ষিক ছয় মাস কাল রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিবে এবং কোন সময়ে বিদেশ গমনে প্রয়োজন হইলে, তিন সহস্র অশ্বারোহী, এবং তিন সহস্র পদাতীসহ তোমাকে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইবে।

উক্ত প্রদেশে (রামপুরার) যতদিন পর্যন্ত মহিমবরের (রাণার) প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত তোমার এই স্বত্বচ্যুতির কোন ভয় নাই।

আদেশক্রমে

সম্বত ১৭৮৫ (১৭২৯ খ্রীঃ) পাঞ্চোলী রায়চাঁদ এবং

৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার মেহেতা মল্লদাস

| রাণার সংকেতিক স্বাক্ষর |

রাণা কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত :

আমার ভাগিনেয় মধুসিংহ সমীপেষু—

প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে রামপুরা প্রদেশ প্রদান করিলাম। যতদিন আমার অধিকারভুক্ত থাকিবে, ততদিন তোমার এ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহের আরো দুটি পত্র ঃ

সাধারণ ভোজ সভাস্থল হইতে আমন্ত্রিতগণের দ্বারা অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজ্যদ্রব্য লইয়া যাইবার বিরুদ্ধে আদেশ।

মরমির অধিবাসীগণের প্রতি—

শ্রীমহারাণা সংগ্রাম সিংহের আদেশ ঃ

সকল প্রকার উৎসবের ভোজস্থল এবং শ্রাদ্ধের ভোজস্থল হইতে কোন ব্যক্তিই ভোজ্যাবশিষ্ট দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি আদেশ লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে অধীশ্বরের নিকট একশত এক মুদ্রা দণ্ডস্বরূপ দিতে হইবে।

সম্বত ১৭৬৯ (১৭১৩ খ্রীঃ) ৭ই চৈত্র।

বাকরোলের বণিক এবং মহাজনগণের প্রতি মহারাণা সংগ্রাম সিংহের আদেশ :

রাজস্ব সংগ্রাহক কর্মচারীবর্গকে শীতবস্ত্র দানের বিরুদ্ধে তোমরা যে অনুযোগ উপস্থিত করিতেছ, সেই শীতবস্ত্র দান প্রথা বহুকাল হইতে চলিত হইয়া আসিতেছে। এখানে রাজস্ব এবং শুল্ক সংগ্রাহক এবং তাহাদিগের অধীনস্থ কর্মচারীগণ যে সময়ে বাকরোলে উপনীত হইবে, সেই সময়ে বণিকগণ তাহাদিগকে শয্যা ও শীতবস্ত্র দিবেন এবং অন্যান্য অধিবাসীগণ অপরাপর কর্মচারীকে তাহা প্রদান করিবেন।

যদি নদীর বাঁধ কোন কারণে, কোনপ্রকারে ভগ্ন হয়, তাহা হইলে তৎ-সংস্কার কার্যে যে ব্যক্তি সাহায্য করিতে অগ্রসর না হইবে, তাহাকে তাহার দণ্ডস্বরূপ একশত একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে।

সম্বত ১৭১৫ (১৬৫৯ খ্রীঃ) আষাঢ় ?

*   *   *   *   *

চিতোর গড়ের বীরত্ব কাহিনীর সঙ্গে যেমন বীর হাম্বীর, চুণ্ডা, রাণা কুম্ভ রাণাসাঙ্গা, ভীমাশা', মহারাণা প্রতাপ ইত্যাদি বীর পুরুষদের নাম জড়িত, তেমন অপরদিকে পদ্মিনী, করমদেবী, মীরাবাঈ ও পান্নাবাঈ-এর নাম ও কিছু কম উচ্চারিত নয়। এঁদের আত্মোত্সর্গ, স্বাধীনতা বোধ বা জহরব্রত পালন এবং বিশেষভাবে পান্নাবাঈ-এর প্রভুভক্তি চিতোর গড়ের ইতিহাসে এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে আছে। পান্নাবাঈ তার প্রভু ভক্তির জন্যে আজো অমর। এবং যতদিন পৃথিবীর ইতিহাস বলে কিছু থাকবে, ততদিন পান্নাবাঈ-এর নাম উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

চিতোর গড়ে বেড়াতে এসে যদি কোন পর্যটক চিতোর গড়ের শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, স্থাপত্য এবং তার রক্তাক্ত ইতিহাসের খোঁজ করেন তবে দেখবেন সেখানে চূড়ান্ত প্রভুভক্তির প্রমাণ স্বরূপ পান্নাবাঈও দাঁড়িয়ে। পান্নাবাঈকে বাদ দিয়ে চিতোরের ইতিহাস অসমাপ্ত। খণ্ডিত। যে পান্নাবাঈ চিতোরের কোন এক দুর্যোগ রাত্রে বনবীরের হাত থেকে উদয়সিংহকে বাঁচিয়েছিল। চিতোরের রাণা বংশের শেষ বংশধরকে জঘন্য হত্যার হাত থেকে রক্ষা করেছিল। সেদিন পান্নাবাঈ উদয় সিংহকে বনবীরের হাত থেকে না বাঁচালে উত্তর যুগে আমরা রাণা প্রতাপকে পেতাম না। চিতোরের স্বাধীনতা যুদ্ধে যার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এমন স্বাধীন চেতা মানুষ ইতিহাসে বিরল।

চিতোরে বেড়াতে এসে যদি পান্নাবাঈকে মনে পড়ে যায় তবে তার বীরত্ব কাহিনী এবং প্রভুভক্তিও কিছুক্ষণের জন্যে স্মরণ করা যেতে পারে। চিতোরের সেই ভয়াবহ রাতে, যেদিন বনবীর গোপনে উদয় সিংহকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, সেই অভিশপ্ত রাতকে অনায়াসেই আমরা আমাদের মানসপটে ফিরিয়ে আনতে পারি। বীরপুরুষ ও স্বাধীনচেতা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পান্নাবাঈ-এর প্রভুভক্তিকেও আরেকবার স্মরণ করতে পারি।

বনবীর পৃথ্বীরাজের জারজ পুত্র। পৃথ্বীরাজের ভাই সংগ্রাম সিংহ যখন চিতোরের রাণার পদে অভিসিক্ত হলেন তখন বনবীর চিতোরের একটি সৈন্য বিভাগের গুরু দায়িত্বের পদে আসীন। তিনি সংগ্রাম সিংহের মন্ত্রী পরিষদেরও একজন সদস্য। বিক্রমাজিত সিংহ মহারাণা সংগ্রাম সিংহের তৃতীয় পুত্র। চিতোরে অনেকদিন থেকেই একটা দল তৈরী হচ্ছিল যাতে ছিলেন বিক্রমাজিত সিংহ, বনবীর, বিক্রমাজিত সিংহের মা, (অর্থাৎ মহারাণা সংগ্রাম সিংহের তৃতীয় স্ত্রী) এবং বিক্রমাজিতের মামা। এঁরা চিতোরে একটা দল গঠন করেছিলেন মহারাণা সংগ্রাম সিংহকে সরিয়ে বিক্রমাজিত সিংহকে রাণা করবার জন্যে। গোপনে এঁদের ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা ইত্যাদি

অনেক কিছুই চলত। মহারাণা সংগ্রাম সিংহও এটা জানতেন। কিন্তু মুখে কিছু বলতেন না। কারণ তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন কেউ বিদ্রোহ করতে সাহস পাবে না। তবে তার সঙ্গে তিনি এটাও জানতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর পরবর্তী কে রাণা হবে এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, কলহ আর কোন্দল লাগবেই। ফলে বহিঃশত্রু এর সুযোগে চিতোর আক্রমণ করবে। চিতোর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং অপরের অধিকারে আসবে। তিনি সেই সঙ্গে এককথাও জানতেন যে আজ যদি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ভোজরাজ বেঁচে থাকতো তবে তাঁর অবর্তমানে চিতোরে এ অবস্থা দাঁড়াতো না। কারণ আইন সম্মতভাবে চিতোরের রাণার পদ তারই প্রাপ্য। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে তাঁর অবর্তমানে কে রাণা হবে, এটা যদি তিনি ঠিক করেও যান পরে সে ব্যবস্থা টিকবে না। তখন কলা-কৌশল, ষড়যন্ত্রই বড় হয়ে দেখা দেবে এবং যার দল মজবুত হবে সেই রাণাপদের জন্য হাত বাড়াবে। এত সব জেনেও তিনি চুপকরে ছিলেন। কারণ তাঁর চুপ করে না থেকে কোন উপায় ছিল না।

কিন্তু তিনি যে ব্যবস্থার কথা তাঁর মৃত্যুর পরে ঘটবে বলে আশঙ্কা করছিলেন সেটা তার বর্তমানেই ঘটে গেল। এবং ঘটলো খুবই আকস্মিকভাবে।

তিনি তখন কানোয়ার ময়দানে বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত। বাবর চিতোরে হাত বাড়িয়েছে। তিনি চিতোর রক্ষা করতে যুদ্ধে গেছেন। এবং বলে গেছেন যে, যুদ্ধে জয়ী না হয়ে তিনি চিতোরে ফিরবেন না। যে চিতোর রক্ষার জন্যে তিনি যুদ্ধে গেছেন এই চিতোরে বসেই তাঁকে রাণার পদ থেকে সরিয়ে এবং চিতোরে ঢুকতে না দিয়ে, নতুন রাণা করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাঁরই তৃতীয় পুত্র বিক্রমাজিত সিংহ, তার মা, তার ভাই এবং বনবীর। বনবীর বরাবরই জানে যে, বিক্রমাজিত সিংহকে রাণা করতে পারলে সে নিজেই রাজত্ব চালিয়ে যেতে পারবে। শুধু সামনে রাখতে হবে বিক্রমাজিত সিংহের মাকে। বনবীর ভাবলো যদি বিক্রমাজিত সিংহের রাণার পদ নিষ্কণ্টক করতে হয় তবে বিক্রমাজিত সিংহের ছোট ভাই উদয় সিংহকে হত্যা করা প্রয়োজন। উদয় সিংহকে হত্যা করতে পারলে বিক্রমাজিত সিংহের রাণার পদ যেমন কণ্টক শূন্য হবে, তেমন সে নিজেও দীর্ঘদিন আরামে রাজত্ব চালাতে পারবে। আর, একবার যদি বিক্রমাজিত সিংহকে চিতোরের রাণা বলে ঘোষণা করা যায় এবং অন্যান্য রাজ্যের এ ব্যাপারে সমর্থন আদায় করা সম্ভব হয় তবে যুদ্ধ ক্লান্ত মহারাণা সংগ্রাম সিংহকে চিতোরের বাইরে থমকে দাঁড়াতে হবে। এবং সেখানেই তাঁর সঙ্গে শেষ যুদ্ধে পরাজিত করতে একটুও অসুবিধা হবে না। কারণ তখন চিতোরের সৈন্যদের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের

সৈন্যরাও এসে যুক্ত হবে। ফলে মহারাণার পরাজয় অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। বিক্রমাজিত সিংহের যে এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল এমন বলা যায় না। কিন্তু উৎসাহ বনবীরেরই বেশী। বনবীর ঠিক করে নিল যে, কোন এক গভীর রাতে উদয় সিংহকে হত্যা করা হবে এবং এ-খবর একান্তই গোপন থাকবে।

শেষে একদিন চিতোর গড়ে সেই ভয়াবহ রাত এসে উপস্থিত হল। উদয় সিংহ চিরকালই পান্নাবাঈ-এর কাছে মানুষ। পান্নাবাঈ-এরও একটা পুত্র সন্তান ছিল। কিন্তু তবুও পান্নাবাঈ উদয় সিংহকে নিজের পুত্রের মত ভালবাসতো এবং লালন-পালন করতো। সেই গভীর রাতে যখন সে খবর পেল যে, বনবীর উদয় সিংহকে হত্যা করতে আসছে তখন পান্নাবাঈ উদয় সিংহকে বাঁচাবার জন্যে নিজের পুত্রকে উদয় সিংহের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উদয় সিংহকে একটা ফলের ঝুড়িতে করে একজন নাপিতের সাহায্যে গোপনে চিতোরের বাইরে পাঠিয়ে দিল। অনেকে বলেন এই পরিকল্পনার পেছনে মীরাবাঈ-এরও হাত ছিল। পরিকল্পনার পেছনে যারই হাত থাক না কেন, এ ধরনের প্রভুভক্তি ও সাহস কোন মহিলা দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। নিজের পুত্রকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়ে প্রভুর পুত্রকে বাঁচানোর চেষ্টা ইতিহাসে বিরল।

যাইহোক বনবীর পান্নাবাঈ-এর মহলে ঢুকে উদয় সিংহকে হত্যা করছে ভেবে পান্নাবাঈ-এর পুত্রকে হত্যা করলো এবং পলকে সে মহল ত্যাগ করে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে বনবীরের এই হত্যার খবর সর্বত্র প্রচারিত হল। এই শোচনীয় সংবাদে অন্তপুরের মধ্যে হাহাকার উঠলো। কান্নার শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হতে লাগলো। সকলেই জানলো উদয় আর নেই। তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ধাত্রীপান্না এ খবর গোপন রেখে চিতোরের বাইরে এসে নাপিতের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। বিশ্বস্ত নাপিত রাজশিশুকে নিয়ে বেরিস নদীর তীরে পান্নার আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলো। এই নদী চিতোর গড় থেকে কয়েক মাইল দূরে। পান্না শেষে ঐ রাজশিশু এবং নাপিতকে নিয়ে দেবলা রাজ্যে এলো, সে রাজ্যের অধিপতি সিংহরাও-এর কাছে উদয় সিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করলো। কিন্তু বনবীরের ভয়ে সিংহরাও উদয়কে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন না। তখন পান্নাবাঈ সেখান থেকে গোপনে ডোঙ্গারপুর নগরে এসে সেখানকার অধিপতি রাউল-অহিস্-করণের কাছে উদয় সিংহের আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। কিন্তু করণ-রাজও বিপদ বুঝে উদয়কে আশ্রয় দিতে রাজী হলেন না। ফলে পান্নাবাঈ আর কোন উপায় না দেখে আরাবল্লী পর্বতের জটিল গুহার মধ্য দিয়ে সেখানকার আরণ্য-ভিল অধিবাসীদের সাহায্যে কমলমীর নগরে এসে উপস্থিত হল। তখন সেখানকার শাসন কর্তা ছিলেন আশা খাঁ। আশা খাঁও সব কথা

শুনে প্রথমে আপত্তি জানালেন। পরে তাঁর মায়ের অনুরোধে উদয় সিংহকে আশ্রয় দিলেন। এবং নিজের ভাগ্নে এই পরিচয়ে মানুষ করতে লাগলেন। পান্নাবাঈ তার কর্তব্য কাজ শেষ করে নাপিতকে সঙ্গে নিয়ে চিতোর গড়ে যাত্রা করল।

কয়েক বছর আশা খাঁর কাছে উদয়ের জীবন ভালভাবেই কাটলো। কিন্তু তারপরেই বিপদ ঘনিয়ে এল। উদয় একটু বড় হতেই তার আচার-ব্যবহার ও চলাফেরা দেখে অনেকেই সন্দেহ করতে লাগলো। কারণ এমন রাজকীয় আচার-ব্যবহার আশা খাঁর ভাগ্নের হওয়া সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। কিন্তু মুখে কেউ কিছু প্রকাশ করলো না। শেষে একদিন এই রাজ শিশুর সাহস দেখে সকলের মনে সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হল।

কোন একদিন আশা খাঁ তাঁর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করলেন। সকলেই একসঙ্গে বসে আহার করছিলেন। এমন সময় রাজকুমার কোন একজনের কাছ থেকে দইয়ের ভাঁড় কেড়ে নিয়ে নিজে খেতে সুরু করে দিলো। তখন উপস্থিত সকলে উদয়কে এ কাজ করতে নিষেধ করলেন, ভয় দেখালেন। কিন্তু উদয় সে কথা না শুনে খেয়ে যেতে লাগলো। সেদিন উদয়ের এই তেজস্বীতা ও স্বাধীন প্রকৃতির স্বভাব দেখে সকলের মনে সন্দেহ আরো বাড়লো। কিন্তু তখনো সকলে কোন কথা না বলে চুপ করে গেলেন। তবে এর পরে যে ঘটনা ঘটলো, তা'তে আর কেউ চুপ করে বসে থাকলেন না।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে শনিগুরু অধিনায়ক আশা খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আশা খাঁ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে উদয় সিংহকে পাঠালেন। সেখানে উদয় সিংহ সে অভ্যর্থনার কাজ এত মর্যাদার সঙ্গে করলো যে শনিগুরু অধিনায়কের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো, এ যুবক কখনই আশা খাঁর ভাগ্নে হতে পারে না। তিনি তাঁর এ দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা সকল রাজ্যের মন্ত্রীদের জানিয়ে দিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে চিতোর গড়ের সম্ভ্রান্ত পুরুষগণ ও কমলমীর নগরের সামন্তগণ উদয় সিংহকে অভিবাদন জানাবার জন্যে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এলেন সালুম্বার সোহিদা সামন্তগণ, চন্দ্রবংশের প্রতিনিধিগণ, চন্দ্রাবত বংশের সামন্তগণ, বাগোরের প্রতিনিধিগণ, কোটারিও এবং বৈদুলার চোহানগণ, শোনিগুরুর সামন্তগণ, এবং আরো নানা রাজ্যের সামন্তগণ। সেখানেই একটা মন্ত্রীসভা গঠন করা হল। ধাত্রীপান্না ও নাপিতকেও ডেকে পাঠানো হল। তারা এসে সেদিনের ঘটনার সাক্ষ্য দিল। ফলে সকলের মনে শেষ সন্দেহটুকুও দূরীভূত হল।

আশা খাঁ সেই সভায় চিতোর গড়ের সম্ভ্রান্ত এবং প্রবীনতম অধিনায়ক কোটারিয়ো চৌহানের কাছে চিতোরের রাজপুত্রকে অর্পন করে নিজের গুরুতর দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করলেন।

এরপর উদয় সিংহকে কুম্ভ গড়ে নিয়ে এসে সেখানে তাকে চিতোরের রাণা বলে স্বীকৃতি জানিয়ে তার অভিষেকের কাজ শেষ করা হল। সেই অভিষেকে চিতোর গড়ের সমস্ত সামন্তগণ যোগদান করল এবং উদয় সিংকে চিতোরের রাণা বলে স্বীকৃতি জানালো।

চিতোর গড়ে তখন রাণার পদে বনবীর বসে। আগেই বিক্রমাজিতকে হত্যা করে নিজে রাণা হয়ে বসেছে। কারণ তার ধারণা ছিল, সে নিজের হাতেই উদয়কে হত্যা করেছে এবং চিতোর বংশে আর বাতি দিতে কেউ নেই। সুতরাং তার রাণার পদে আর কেউ বাধা দিতে আসবে না। সে চিতোর গড়ের স্থায়ী রাণা। কিন্তু উদয়ের অভিষেকের খবর ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বনবীর প্রথমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে গেল। কিন্তু যখন দেখলো যে তার স্ত্রী স্বয়ং উদয়ের পক্ষে তখন বনবীর আর দেরী না করে চিতোর থেকে পলায়ন করলো। চিতোরে উদয় সিংহের রাজত্বকাল সুরু ১৫৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে।

*   *   *   *   *

চিতোর গড়ে এলে পান্নাবাঈ-এর প্রভুভক্তি এবং সাহসিকতাকে যেমন মনে পড়বে, ঠিক তেমনই মনে পড়বে রতন সিংহের স্ত্রী পদ্মিনীকে। রতন সিংহ মহারাণা সংগ্রাম সিংহের আর এক পুত্র। চিতোরের রাণার পদের লোভে বনবীর যেমন বিক্রমাজিতকে হত্যা করে, তেমন রতন সিংহকেও হত্যা করে। তার স্ত্রী পদ্মিনী সতীত্বের পরীক্ষায় স্মরণীয় হয়ে আছে। পদ্মিনী অত্যন্ত সুন্দরী, জ্ঞানী বুদ্ধীমতী ছিল। নিজের বুদ্ধির জোরে সে তার স্বামীকে আলাউদ্দিন খিলজীর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তখন চিতোরের আক্রমণকারী ছিল আলাউদ্দিন খিলজী। রতন সিংহের প্রাসাদের একটু দূরে পদ্মিনীর প্রাসাদ। একটা ছোট লেকের গায়ে। মাঝে জানানা দ্বীপ।

পরে দিল্লীর সম্রাট চিতোর আক্রমণ করলে রতন সিংহ চিতোর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তখন পদ্মিনী নিজের আত্মসম্মান বাঁচাবার জন্য তার অনুগামীদের নিয়ে 'জহরব্রত' পালন করে।

Col. Todd পদ্মিনী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন: "her beauty accomplishment, exaltation and destruction, with other incidental circumstances, constitute the subject of one of the most popular traditions of Rajwora."

* * * * *

চিতোরের ইতিহাস শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব আর যুদ্ধের ইতিহাস। একদিকে যেমন শিল্প, কলা, সংগীত ও স্থাপত্যের ইতিহাস। অপরদিকে তেমন বীরত্ব, যুদ্ধ, কলহ, কোন্দল আর ভোগ লালসার ইতিহাস। আবার অন্যদিকে রাজপুত রমণীদের "জহরব্রতর" ইতিহাস। সতীত্বের ইতিহাস।

বাহাদুর শাহ যখন চিতোর আক্রমণ করল তখন চিতোর বীর শূন্য। চিতোর গড়ে হতাহতের সংখ্যা অনেক। কিছু সেনাপতি হত এবং কিছু পলাতক। রাণা রতনসিংহ যুদ্ধ জয়ের আশা ত্যাগ করে অন্য রাজ্যে আশ্রিত।

রাজপুত রমণীরা প্রথমে চিতোর গড়ের ময়দানে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু শেষে ব্যর্থ কাম হয়ে 'জহর ব্রতর' সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজপুত রমণীগণের সতীত্ব রক্ষার জন্যে 'জহর ব্রত' বা আত্মবলির উপাদান সামগ্রীর আয়োজন হতে লাগলো। চিতা সাজাবার আর সময় নেই। চিতোরের সুড়ঙ্গ পথ রক্ষা করতে গিয়ে অসংখ্য রাজপুত বীর এবং রমণীরা আত্মাহুতি দিয়েছে। আর চিতোর রক্ষার কোন সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং 'জহর ব্রত' বা আত্মাহুতি। চিতোরের বুকে বিশাল এক গর্ত খনন করা হল। এই সকল গর্ত বারুদে ও নানাপ্রকার দাহ্য পদার্থে পূর্ণ করা হল। রাণা বাঘজীর মা কর্ণাবতী তেরো হাজার রাজপুত রমণীর অনুগামিনী হয়ে এই জলন্ত কৃত্তিম গিরি-গহবরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বারুদ এবং দাহ্য পদার্থ জ্বলে উঠলো। নিমেষে রাজমহিষী কর্ণাবতী ও তেরো হাজার রাজপুত রমণী প্রাণ বিসর্জন দিল। ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল।

চিতোর গড়ে সেই জহরব্রতের স্থান এখনো আছে। কোন পর্যটক যদি এখানে এসে একটু দাঁড়ান তবে তাঁর মনে চিতোর গড়ের এই অতীত ইতিহাস নিমেষেই মনে পড়ে যাবে। চিতোর গড়ের শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব আর যুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যে এইসব রাজপুত রমণীরাও এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। চিতোর গড়ে কেউ বেড়াতে এলে তিনি যেমন চিতোরের বীরত্বর ইতিহাসে মুগ্ধ হবেন। চিতোরের শিল্প, কলা, সংগীত, সাহিত্য এবং স্থাপত্য দেখে অবাক হবেন। ঠিক তেমনই আবার এই 'জহরব্রতের' স্থানে এসে নিজের অজান্তেই দু' ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়বে। অতীত ইতিহাস-রমণীদের সমবেদনায় মন আপন হতেই ব্যথিত হবে।

বাহাদুর শাহ যখন চিতোর জয় করলেন তখন চিতোর শ্মশানে পরিণত। বাহাদুর শাহ চিতোরের এই দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত। অসংখ্য মৃত দেহ ভীষণ আকার ধারণ করে পড়ে আছে। এই দৃশ্যের চেয়েও ভীষণতর সংবাদ হচ্ছে চিতোর রমণী শূন্য। বাহাদুর শাহ চিতোর দখল নেবার

আগেই তারা আত্মাহুতি দিয়েছে। একজনও আর বেঁচে নেই। কারণ তৎকালীন প্রচলিত নিয়মে বিজেতা নরপতি বিজিত নরপতির স্ত্রীগণকে কারারুদ্ধ করে নিয়ে গিয়ে নিজের ভোগ-সেবায় নিযুক্ত করে থাকে। বিজিত নরপতির স্ত্রীগণকে বিজেতা নরপতিগণ ভাগ করে নিয়ে থাকে। এই নিয়ম বা ব্যবস্থা রাজপুত রমণীরাও জানতো। সেই কারণেই এই 'জহর-ব্রত' এবং আত্মাহুতি।

এ সম্পর্কে তৎকালে একটা কথা খুব বেশী প্রচলিত ছিল। এখনো আছে।

[বিজেতা নরপতি বিজিত নরপতির স্ত্রীগণকে কারারুদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ ভোগ সেবার নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য বিজেতা বীর বৃন্দ বিজিত বৃন্দের পত্নীগণকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া থাকেন। এইরূপ বিবাহকে মনু রাক্ষস বিবাহ বলিয়াছেন। এরূপ বিবাহের প্রথা অন্যদেশেও প্রচলিত ছিল। ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টের একস্থানে সিসেরা জননী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তাঁহারা কি বিজিত রমণীগণকে প্রত্যেকে দুই একটি করিয়া ভাগ করিয়াছেন ?"

Judges. V. 31]

কর্ণাবতী তেরো হাজার রাজপুত্র রমণীকে সঙ্গে নিয়ে 'জহরব্রত' পালন করেছেন। আজ চিতোর রমণী শূন্য। রাজপুত বীরেরাও চিতোর অবরোধ এবং আক্রমণে নিহত। চিতোর আজ জনশূন্য।

বাহাদুর শাহ দু' সপ্তাহ চিতোরে অবস্থানের পর খবর এল যে, হুমায়ুণ চিতোর আক্রমণ করতে আসছে। বাহাদুর শাহ আর অপেক্ষা না করে পালিয়ে গেলেন। পরে হুমায়ুন চিতোর দখল নিল।

এই ঘটনার পরেও আবার চিতোর গড় রাণাদের দখলে এসেছে। এবং আবার মুশলমানদের হাতে চলে গেছে। এইভাবে এই চিতোর গড় হাত বদলাতে বদলাতে চিতোরের শেষ রাণা উদয় সিংহের হাতে এসেছে। উদয় সিংহের প্রসঙ্গে আগেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

যে চিতোর গড় হাজার বছর ধরে বিখ্যাতনামা নৃপতিদের বীরত্বের ভূমি ছিল, যে চিতোর গড় হাজার বছর ধরে ভারতের শ্রেষ্ঠ গড় বলে অভিহিত ছিল, উদয় সিংহের রাজত্বকালেই চিতোর গড়ের সে সূর্য অস্তমিত হল। এবং এই অস্তমিতের জন্যে উদয় সিংহ মোটামুটিভাবে নিজেই দায়ী।

বালক বয়সে আশা-শা'র প্রাসাদে যখন উদয় সিংহ ছিলেন, তখন তাঁর বেশ তেজ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু রাজা হয়ে যত বয়স বাড়তে লাগলো তত আরাম-বিলাসের দিকেই তিনি মন দিতে লাগলেন। রাণার গৌরব রাখতে, রাণার গৌরব বাড়াতে পূর্বের রাণারা যেমন চিন্তা-ভাবনা ও

কষ্ট স্বীকার করেছিলেন, উদয় সিংহ তেমন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ভোগ বিলাসই তাঁকে টানতো বেশী।

তবুও তিনি মনে মনে এই আশা পোষণ করতেন যে, একদিন তিনি তামাম হিন্দুস্তানের রাজ চক্রবর্তী হবেন। সেই রকম একটা শক্তি তিনি এক সময় গড় তোলার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু শিকরির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। উত্তর ভারতে তখন মোগল বাদশাহী কায়েম হবার যুগ। বাবর মৃত। হুমায়ুনের রাজত্বকাল চলছে। হুমায়ুন বীর হলেও রাজনীতিতে তেমন চতুর ছিলেন না। বাবর অথবা আকবরের মত অত কষ্ট সহ্য করতে বা রাজনীতি করতেও পারতেন না। হুমায়ুনের রাজত্বের ১৫।১৬ বছর পরে বালক আকবর বাদশাহ হন। কিন্তু তখন তিনি নামেই মাত্র বাদশাহ। বাদশাহী মসনদের চারপাশে তখন গোলমাল আর বিশৃঙ্খলা। সমস্ত পাঠানেরা তখন আকবরের শত্রু। আকবরের এই অবস্থায় চিতোরের পূর্বপুরুষ মহারাণা সংগ্রাম সিংহের কথা মনে পড়ে। তাঁর আজীবন স্বপ্ন ছিল উত্তর ভারতে হিন্দু রাজ্য কায়েম করা। আজ তিনি থাকলে এ-সুযোগ ছাড়তেন না। এবং শেষ অবস্থা কি দাঁড়াতো বলা যায় না। তবে এ-কথা অনায়াসেই বলা চলে যে, আকবরের বাদশাহী মসনদ একবার শেষ বারের মত নড়ে উঠতো। কিন্তু মহারাণা সংগ্রাম সিংহের রাজত্বকালে উত্তর ভারতে হাত দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। এছাড়াও গৃহ রাজনীতির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ে তিনি আর সেদিকে মন দিতেও পারেননি। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পরে উদয় সিংহের মৃত্যু পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৫০ বছরে চিতোরে এমন কোন বীর্যবান, তেজস্বী ও যোদ্ধা রাণার আবির্ভাব ঘটেনি, যিনি তামাম হিন্দুস্তানের একাধিপতি হতে পারেন।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহের প্রথম পুত্র ভোজরাজের (যিনি সাধিকা, কৃষ্ণ প্রেমিকা, ভক্তি সংগীত রচয়িতা ও সুর স্রষ্টা মীরাবাঈ-এর স্বামী) অকালে যুদ্ধে মৃত্যু হয়। মহারাণা তাঁর এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর অত্যন্ত আশা পোষণ করতেন। কারণ তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও রাজনীতির সঙ্গে ভোজরাজের চিন্তার অনেক মিল ছিল। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মত তামাম হিন্দুস্তানে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ভোজরাজের মুখেও শোনা যেত। ভোজরাজ মীরাবাঈকে প্রায়ই একথা শোনাতেন। ভোজরাজ তাঁর পিতার মতই সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মত তিনিও জানতেন যে, অস্ত্র দিয়ে রাজ্য জয় করা যায় বটে কিন্তু রাজ্য শাসন করা চলে না। রাজ্য শাসন করতে গেলে লাগে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের ভালবাসা ও সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ নীতি। যে নীতি

তাঁর পরবর্তী কালে আকবর গ্রহণ করেছিলেন। এবং তামাম হিন্দুস্তানে তাঁর বাদশাহী মসনদ কায়েম করেছিলেন। আকবরের কাল সংগ্রাম সিংহের পরবর্তী কাল। কিন্তু সংগ্রাম সিংহ এ-চিন্তা অনেক আগেই করেছিলেন। ভোজরাজের অকাল মৃত্যু এবং গৃহ রাজনীতির ঝড়ে তিনি সে চিন্তা কাজে লাগাতে পারেননি। ভোজরাজের মৃত্যু মহারাণা সংগ্রাম সিংহের সমস্ত রাজনৈতিক ভাবনার ওপর একটা প্রচন্ড আঘাত হেনেছিল। যাইহোক ভোজরাজের মৃত্যুর পর পরবর্তী রাণা পদের লড়াই চিতোরে গৃহ রাজনীতি ডেকে নিয়ে এল। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বুঝলেন যে, তামাম হিন্দুস্তানের হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার তিনি যে চিন্তা করেছিলেন, ভোজরাজের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তা সমাধি লাভ করেছে। এখন চিতোরকে ঠেকিয়ে রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর রাণা পদের লোভ গৃহ রাজনীতিকে আরো ঘোরালো করে তুলবে। এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণকে চিতোরের যে কোন একপক্ষ স্বাগতঃ জানাবে। ফলে চিতোর টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি উপায়হীন। এবং একপ্রকার উপায়হীন হয়ে তার দ্বিতীয় পুত্র রত্ন সিংহকে তাঁর পরবর্তী রাণা বলে ঘোষণা করেন। তাঁর এ ঘোষণায় আপৎকালীন গৃহ রাজনীতি বন্ধ হল বটে তবে চিতোরে পরবর্তী কালের দুর্দিন দানা বাঁধতে লাগলো। ভোজরাজ বেঁচে থাকলে অবশ্য এই গৃহ রাজনীতির সুযোগ আসতো না। মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে তিনি স্বাভাবিকভাবেই রাণা হতেন।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রত্ন সিংহ রাণা হলেন। গৃহ রাজনীতি আপাততঃ থামলো বটে তবে মহারাণার অন্যান্য রাণীরাও তাঁদের নিজেদের পুত্রকে রাণা করবার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের তিন রাণী ছিল। বড় রাণীর পুত্র ভোজরাজ। মেজ রাণীর পুত্র রত্ন সিংহ এবং ছোট রাণীর পুত্র বিক্রমাদিত্য ও উদয় সিংহ (মহারাণা প্রতাপ সিংহের পিতা)।

যাইহোক রত্ন সিংহের তেজ, বিক্রম, বীরত্ব, দেশপ্রেম এ-সবই ছিল। কিন্তু বেশী দিন রাজত্ব করবার সুযোগ পাননি। তাঁরও অকালে মৃত্যু হয়। তারপর তাঁর ভাই বিক্রমাদিত্য চিতোরের রাণা হন। তিনি এককথায় রাণা বংশের অযোগ্য বলা যায়। তিনি তাঁর বড় ভাই ভোজরাজের স্ত্রী মীরাবাঈ-এর প্রতি (বিধবা) অকথ্য অত্যাচার ও অবিচার করেছিলেন। যার ফলে মীরাবাঈকে চিতোর ছেড়ে বৃন্দাবনে চলে যেতে হয়। মীরাবাঈ-এর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের চিন্তা-ভাবনার মূলেই কোন মিল ছিল না। মীরাবাঈ ছিলেন সাধিকা, কৃষ্ণপ্রেমিকা, সংগীত রচয়িতা ও সুরস্রষ্টা। তিনি বৈষ্ণবী। চিতোরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার লাভের জন্যে আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। চিতোরে বৈষ্ণব ধর্মের তিনি প্রবক্তা। তাঁর

সময়েই চিতোরে সমস্ত বৈষ্ণব-মন্দির তৈরী হয়। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের এবং ভোজরাজের মত সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়বাদে মীরাবাঈও বিশ্বাসী ছিলেন। পিতা এবং পুত্র দু'জনেই মীরাবাঈ-এর কৃষ্ণপ্রেমের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।

কিন্তু বিক্রমাদিত্য ছিলেন শাক্ত। শক্তির উপাসক। (চিতোরের রাণারা সকলেই শাক্ত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মহারাণা সংগ্রাম সিংহ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজ বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজে মীরাবাঈকে প্রভূত সাহায্য ও সহযোগীতা করেছিলেন)। রাণা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে মীরাবাঈ-এর মূল আদর্শের সংঘাতের সূত্রপাত এইখান থেকেই। পরবর্তী কালে সে সংঘাতের আরো প্রসার লাভ ঘটে এবং অত্যন্ত তিক্ততার মধ্যে সে বিবাদের যবনিকাপাত হয়। তখন মীরাবাঈ তাঁর সাধনার স্থান হিসেবে বৃন্দাবনকেই বেছে নেন এবং সেখানেই চলে আসেন।

বিক্রমাদিত্যের অযোগ্যতার সুযোগ নেন পৃথিবরাজের জারজপুত্র বনবীর। তিনি বিক্রমাদিত্যকে হত্যা করে নিজেকে রাণা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালও বেশীদিন নয়। চিতোরের সামন্ত, সর্দার ও মন্ত্রী-পরিষদ বনবীরকে সরিয়ে বিক্রমাদিত্যের ছোট ভাই উদয়সিংহকে রাণা করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন আরাম-বিলাসী ও ভোগী। বীরত্ব, তেজ, যুদ্ধের কলা-কৌশল ও রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব পালনে আগ্রহী ছিলেন না। ওদিকে আকবর দিল্লীর মসনদে। তিনি অতীব চতুর, শক্তিমান, বুদ্ধিমান এবং রাজনীতিতে কলাকুশলী। আকবর মসনদে বসেই রাজ্যের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও গোলমাল থামিয়ে একটা সুন্দর শাসন-ব্যবস্থা চালু করলেন। পাঠানেরা তখনো তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি দেখলেন যে, এই পাঠানদের শায়েস্তা করতে গেলে বীর রাজপুতকে আগে হাতে আনা দরকার। সেই কারণে তিনি গোপনে অনেক ছোট ছোট রাজ্যের রাণাদের প্রলোভনের মাধ্যমে নিজের দলে টানতে লাগলেন। এবং অনেকের দুহিতাকে বিবাহ করে নিজে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হলেন। এরপর তিনি রাজ্য বিস্তারে মন দিলেন। পাঠানেরা তখন অনেক অংশে দুর্বল হয়ে এসেছে। উদয়সিংহ এ-সব গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। তিনি এ-সব দেখেও দেখলেন না। এ-সব রাজনীতিতে মাথাও ঘামালেন না। ফলে তাঁকে মূল্য দিতে হল অনেক। আকবর নানাভাবে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করে শেষে একদিন চিতোর আক্রমণ করে বসলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। কিন্তু উদয় সিংহ আকবরের যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখে হতবাক হয়ে আরাবল্লীর সঙ্কট গিরিগুহায় পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করলেন। তিনি সুরুতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ যুদ্ধে তাঁর পরাজয় অনিবার্য। উদয় সিংহ পালিয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচালেন বটে কিন্তু

চিতোরের অনেক বড় বড় বীর চিতোর রক্ষায় এগিয়ে এলেন। চিতোরের যিনি মহারাণা তিনি রাণাকুলের প্রতিনিধি। এবং তাঁর হুকুমই শেষ হুকুম। তিনি ছাড়া তাঁর বংশের আর সকলেই মেবারের সর্দার। অবশ্য রাণাকুলের সর্দার ও মেবারের সর্দারের মধ্যে মান-মর্যাদার অনেক পার্থক্য। চণ্ড এমন একজন রাণাকুলের সর্দার। তাঁর অনেক পুত্র এবং পৌত্র ছিল। কয়েক পুরুষের মধ্যেই চণ্ডের বংশ বেশ বড় হয়ে পড়ে। এবং কয়েক শাখায় ভাগ হয়ে যায়। চণ্ডের বংশের সকল শাখার নাম ছিল "চন্দ্রাবৎ"।

এই সময় অনেক 'চন্দ্রাবৎ' বীর চিতোর রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করেন। রাঠোর বীর জয়মল প্রধান সেনাপতি। তাঁর সঙ্গে শালুম্বার সর্দার সাহিদাস কৈলোয়ার সর্দার পুত্র এরাও আছেন। আর মাদেরিয়ার সর্দার রাবৎদুদা। এই তিন জন বড় বীর নিজেদের দলবল নিয়ে চিতোর রক্ষার জন্যে এগিয়ে এলেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়মলের আকস্মিক মৃত্যুতে রাজপুতদের সমস্ত আশা-উৎসাহ সব শেষ হয়ে গেল। জয়মলের স্থান নিতে পারে চিতোরে আর এমন কেহ ছিল না। চিতোর আকবরের হাতে চলে গেল। অবশ্য এই চিতোর গড় হাতে পেতে আকবরকেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। চিতোর গড়ের সৈন্য সামন্তেরা দীর্ঘদিন আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল।

চিতোর গেল। আরাবল্লী পর্বতের মধ্যে যে পাহাড়-পর্বতে এবং জঙ্গল অঞ্চলে হারীতের আশ্রমে বাপ্পারাওল সাধনা করেছিলেন, উদয় সিংহ সেই অঞ্চলের দিকে চলে আসেন। পাহাড়-পর্বতে ঘেরা সে অঞ্চলে কোন শত্রু সহজে প্রবেশ করতে পারে না। সেখানে একটি ছোট উপত্যকার মধ্যে উদয় সিংহ একটা বড় দিঘী কাটান। তার নাম দেন 'উদয় সাগর'। এই উদয় সাগরের কাছেই একটা পাহাড়ের ওপর তিনি নিজের বাসস্থান গড়ে তোলেন। সেই বাসভূমির নাম 'নচৌকি'। তিনি এখানেই বাস করতে থাকেন। এরপর চিতোর দু'ভাগ হয়ে যায়। চিতোরের সমস্ত সমতল ভূমি আকবরের দখলে আসে এবং পার্বত্য ভূমি থাকে উদয় সিংহের দখলে। চিতোর গড়ের যুদ্ধে যাঁরা মারা যাননি এবং আকবরের অধীনতা স্বীকার করতে রাজী নন, এমন বহু সর্দার উদয় সিংহের সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে আসেন এবং উদয় সাগরের পাড়ে 'ন চৌকির' কাছে নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ করেন। চিতোরের সমতল ভূমি থেকে অনেক সর্দার এবং প্রজা সেখানে চলে আসার ফলে ঐ উদয় সাগরের পাড়ে আবার এক নতুন নগরের পত্তন হয়। নাম উদয়পুর। উদয় সিংহ আবার নতুন করে উদয়পুরেই নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। দুর্গম পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, গুহা ও জলস্রোত ভেদ করে উদয়পুরে আসা কোন শত্রুর পক্ষে সহজ সাধ্য ছিল না। আকবর আপাততঃ সে চেষ্টা করলেনও না। মেবার দু'ভাগ হয়ে

গেল। চিতোরের ভাগ আকবরের দখলে রইলো। এবং উদয়পুর উদয়ের শাসনে। শেষের ভাগে পাহাড়-পর্বতই বেশী। কিন্তু তা'হলেও মেবারের কিছু অংশে রাণাদের আধিপত্য রইল। রাণারা কোনপ্রকারে টিকে রইলেন। এবং পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে আবার লুপ্ত গৌরব ফিরে পাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই যুদ্ধের পর উদয় সিংহ বার বার চিতোর ফিরে পাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সক্ষম হননি। উদয়পুরে ৪/৫ বছর রাজত্ব করবার পর উদয়সিংহের মৃত্যু হয়। উদয়সিংহের অনেক রাণী এবং পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপ। অপর তিন পুত্রের নাম শক্ত, সাগরজী এবং জগমল।

তখন সারা রাজ্যের হিন্দুরাজ্যের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, রাণা মারা গেলে বড় ছেলে রাণা হবে। এমন একটা নিয়ম তাঁরা মেনে চলতেন রাজ্যের যুদ্ধ, বিগ্রহ এবং গোলমাল এড়াবার জন্যে। এই নিয়মে বাঁধা না থাকলে রাণার মৃত্যুর পর ভাইদের মধ্যে গোলমাল লাগে। যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। শেষে যে ভাইয়ের বল বেশী সে আর সব ভাইকে হারিয়ে নিজেকে রাণা বলে ঘোষণা করে। এমন কি তার অন্যান্য ভাইকে হত্যাও করতে পারে। সেই কারণে চিতোর গড়ের রাণারা দীর্ঘকাল একটানা রাজত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু মোগল বাদশাহদের মধ্যে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম না থাকায় এক বাদশাহের মৃত্যুর পরেই তাঁর পুত্রদের মধ্যে তুমুল লড়াই আসন্ন হয়ে পড়ে। এবং যাঁর শক্তি বেশী তিনি বাদশাহ হয়ে বসেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কিন্তু মৃত্যুর আগে উদয় সিংহ সে চিরাচরিত প্রথা না মেনে তাঁর ছোট স্ত্রীর পুত্র জগমলকে উদয়পুরের রাণা করে যান। কথিত আছে যে, তিনি তাঁর ছোট স্ত্রীকে বেশী ভাল বাসতেন। এবং স্ত্রীর অনুরোধ রাখতেই তাঁর এই কাজ।

জগমল সিংহাসনে বসলেন। প্রতাপ সিংহ কিছু বললেন না। কিন্তু উদয় পুরের সর্দার, সামন্ত এবং প্রজারা এটা পছন্দ করেননি। তাঁরা এ-কাজকে রাজ্যের অমঙ্গল বলে মনে করলেন। এবং প্রতাপকে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা সকলে গোপনে সভা করলেন এবং স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে একদিন জগমলের দরবারে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে রইলেন চন্দ্রাবৎ সর্দার, রাবৎকৃষ্ণ এবং শোনি গুরু সর্দার। এঁরা ছিলেন সর্দারদের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানীয় এবং শক্তিমান। রাজ্য চালাতে গেলে এঁদের সহযোগীতা অপরিহার্য। এঁরা দরবারে গিয়ে জগমলকে সোজাসুজি সিংহাসন ছেড়ে দিতে বললেন। জগমলও বুঝলেন যে, এ'দের সামনে বল দেখিয়ে বা শাসনের কথা বলে কোন ফল হবে না। তিনি সিংহাসন ছেড়ে

দিলেন। তখন সর্দারেরা প্রতাপ সিংহকে রাণা বলে অভিবাদন জানিয়ে সিংহাসনে বসালেন। এবং রাজ্য শাসনে সহযোগীতা করতে লাগলেন।

চিতোরের সর্দারেরা ধর্ম ও ন্যায়ের বিধানকে মেনে চলতেন এবং বড় করে দেখতেন। সেই কারণেই এক সময় মেবারের গৌরব ভারতের গৌরব ছিল।

প্রতাপ রাণা হলেন। এদিকে আকবর উদয় সিংহের রাজত্ব কালের মধ্যেই অন্যান্য রাজপুত রাণাদের হাত করে ফেলেছিলেন। এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি চিতোর পেলেন। কিন্তু উদয় সিংহকে পেলেন না। উদয় সিংহ এমন স্থানে চলে গিয়েছিলেন যে, তাঁকে ধরা অসম্ভব। আপাততঃ আকবর এদিকে আর হাত বাড়ালেন না। চেষ্টাও করলেন না।

অম্বর বা জয়পুরের রাজা বিহারীমল আর তাঁর পুত্র ভগবান দাস প্রথম থেকেই আকবরের পক্ষে যোগদান করেন। বিহারীমলের এক কন্যাকেও আকবর বিবাহ করেছিলেন। মোগল হারেমে হিন্দু কন্যা নিয়ে আসবার প্রথা আকবরই প্রথম চালু করেন। রাজনৈতিক কারণে তিনি রাজপুতদের আপন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এবং তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারও করতে লাগলেন। তাঁর অনুগত রাজপুতদের বিশ্বাস করে দিল্লীর দরবারে ভাল ভাল পদও দিতে লাগলেন। এবং আত্মীয়তা পাতাবার জন্যে বিবাহও করতে লাগলেন। আকবরের ধারণা ছিল রাজপুতেরা জাতিতে আর্য। এরা প্রাচীন সূর্য এবং চন্দ্রবংশ থেকে উদ্ভূত। মহাভারতের ভীম, অর্জুন, কৃষ্ণ, বলরাম এবং রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণের রক্ত এদের দেহে প্রবহমান। এদের ধর্ম, আচার, নিয়ম ভারতের গৌরব।

আকবর ছিলেন তুর্কী বংশীয়। জাতিতে ম্লেচ্ছ। তিনি জানতেন যে, হিন্দুরা তাঁদের ম্লেচ্ছ ও অপবিত্র মনে করে। সুতরাং এই রাজপুত কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আসতে পারলে তাঁর বংশের গ্লানিও কিছুটা কমে যাবে। সেই কারণেই তাঁর এই বৈবাহিক আত্মীয়তার প্রচেষ্টা এবং শেষে সফলতা লাভ। প্রথমে রাজপুত হিন্দুরা কন্যাদানে আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু পরে যখন দেখলেন যে, এই আত্মীয়তায় তাঁদের রাজ্য সুরক্ষিত এবং গৌরব বাড়বে তখন অনেকেই সাহস করে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁরা মনে করতে লাগলেন যে, এতবড় একটা শক্তিকে পাশে পাওয়া গৌরবের বস্তু। শেষে এ-আত্মীয়তা একটা সম্মানীয় কাজ হয়ে দাঁড়াল।

চিতোর জয়ের কিছুকাল পরেই আকবর মারবার জয় করেন এবং পরে অম্বর। ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা অবস্থা বুঝে নিজেরাই বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন।

উদয় সিংহ অনায়াসেই আকবরের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে পারতেন। কিন্তু তিনি আজীবন নিজের মান, মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করেই দেহত্যাগ করেন।

মহারাণা প্রতাপ সিংহের তেজ, বিক্রম, বীরত্ব ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তিনি মোগলের কাছে মাথা নত করার চেয়ে মৃত্যুকেও শ্রেষ্ঠ বলে জানতেন। তিনি বলতেন: 'মেবার আমার মা। মাকে কলঙ্কিত করবার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।'

প্রতাপের যেমন জেদ ছিল যে, তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করবেন না। আকবরও তেমন জেদ ধরেছিলেন যে, তিনি যে ভাবেই হোক প্রতাপকে বশে আনবেনই। রাজস্থানে মেবারই সকলের বড়। ও রাজ্যটাই যদি তিনি নিজের হাতে না পেলেন তবে কিসের সাম্রাজ্য। কিসের প্রভুত্ব, কিসের আধিপত্য। সুতরাং তাঁর কাজ হল ছলে, বলে এবং কৌশলে প্রতাপকে পরাজিত করা। তিনি নানাভাবে প্রতাপকে দমন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এদিকে সমস্ত আর্যাবর্তে হিন্দুর কোন প্রভুত্ব নেই। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ আর্যাবর্তে হিন্দুর প্রভুত্ব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। সেই আর্যাবর্তের হিন্দু রাজপুতরাই এখন আকবরের হাতে। এইসব হিন্দুদের হাতে পেয়ে আকবর তাঁর বাদশাহী শক্তি দৃঢ় করে নিয়েছিলেন। এখন এ-শক্তিকে ভাঙ্গন ধরানো অসম্ভব। অম্বর, মারবার, বুন্দি সকলেই মোগলের পক্ষে এবং তাঁরাও চান যে তাঁদের মত প্রতাপও বশ্যতা স্বীকার করুক।

প্রতাপের শত্রু শুধু বাইরেই নয় ঘরেও। প্রতাপের এক ভাই সাগরজীকে আকবর বড় পদ দিয়ে দরবারে নিয়ে গেছেন। সাগরজী শেষে মুশলমানও হয়েছিলেন। প্রতাপের আরেক ভাই শক্ত তিনিও শেষে আকবরের দলে যোগ দিয়েছিলেন।

এত গুরুতর অবস্থার মধ্যেও প্রতাপ সিংহ ভেঙ্গে পড়েননি। তিনি আশাবাদী। মেবারের অর্ধেক গিয়েছে। স্বয়ং আকবর শত্রু। প্রায় সমস্ত রাজপুত রাজারাও তাঁর বিপক্ষে। নিজের ভাই সাগরজী এবং শক্ত সিংহ তাঁরাও শত্রুপক্ষে। কিন্তু প্রতাপ দমলেন না। তিনি তাঁর মনের দৃঢ়তা আর সংকল্প আরো বাড়ালেন। তিনি সংকল্প করলেন যে, এই পাহাড়-জঙ্গলে ভরা অর্ধেক মেবারের বলেই তিনি আকবরের বিরুদ্ধে লড়বেন। নিজের মান, কুল রাখবেন। তবু তুর্কীদের কাছে মাথা নত করবেন না। তুর্কীদের করুণায় সুখ, সম্পদ ও ভোগের আশা মনে স্থান দেবেন না। তিনি নিজের রাজ্যের শাসনব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করলেন। প্রজাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারে তাঁদের মন জয় করে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দেশপ্রেম ও জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর রাজ্য ছোট। জনবল অল্প। তবুও এঁদের নিয়েই আবার লড়বার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন। তিনি উদয়পুর, কমলমীর, গোগুন্ডা প্রভৃতি যে সব পাহাড়ী দুর্গ তাঁর অধিকারে ছিল, সেইসব দুর্গকে আরো

সুরক্ষিত করলেন এবং সাধারণ মানুষকে সেনাদলে ভর্তি করে যুদ্ধবিদ্যা শেখাতে লাগলেন। মেবারের সমতল ভূমি প্রায় সব আকবরের হাতে। প্রতাপ সিংহ আদেশ দিলেন, মেবারের যাঁরা খাঁটি প্রজা, রাণার শাসন যাঁরা চান, দেশের এই দুর্দিনে মঙ্গল যাঁরা চান, স্বদেশের বিদ্রোহী যাঁরা নন, তাঁরা সমতল ভূমি ছেড়ে এই পাহাড়ী অঞ্চলে চলে আসবেন।

রাণার এই আদেশ অনেকে যেমন পালন করলেন কিছুলোক অমান্য করতেও কুণ্ঠাবোধ করলেন না। প্রতাপ সিংহ সুবিধামত তাঁদের রাজদ্রোহী বলে শাস্তি দিতে লাগলেন। আকবর যাতে চিতোরের সমতল ভূমির শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে না পারেন সেই জন্যে রাণা প্রতাপ মাঝে মাঝে সৈন্য নিয়ে সমতল ভূমির গ্রামগুলোকে লণ্ডভণ্ড করে দিতে লাগলেন। অরাজকতা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি তাঁর দল বল বাড়াতে লাগলেন। বেশ কিছু বছর এইভাবেই কাটলো।

মানসিংহ তখন জয়পুরের রাজা। বিহারীমল ও ভগবান দাসের মৃত্যু হয়েছে। ভগবান দাসের ভাইপো মানসিংহ সেই কারণেই জয়পুরের মসনদে। বিহারীলালের কন্যা এবং ভগবান দাসের ভগ্নীকে আকবর বিবাহ করেন। সুতরাং আকবর মানসিংহের পিসেমশাই। আকবরের যে যোধপুরী বেগম ছিল সেলিম তাঁরই ছেলে। সেলিমের সঙ্গে আকবর মানসিংহের এক ভগ্নীর বিবাহ দেন। বাদশাহী পরিবারের সঙ্গে জয়পুরী পরিবারের বড় ঘন কুটুম্বিতার সম্পর্ক। মান সিংহের মান আদর এবং পদমর্যাদাও মোগল দরবারে বেশী।

মান সিংহের শক্তি যথেষ্ট। তিনি আকবরের সবচেয়ে বড় সেনাপতি। রাজ্য শাসনের বুদ্ধিতেও মান সিংহ কম ছিলেন না। দূরের যে প্রদেশে বেশী গোলমাল হত আকবর মান সিংহকে সেখানেই শাসনকর্তা করে পাঠাতেন। মান সিংহও সহজেই সব গোলমাল দূর করে সেই প্রদেশ বশে এনে ফেলতেন।

আমাদের এই বাংলাতে তখন পাঠান রাজার রাজত্ব। মান সিংহ-ই পাঠানদের দূর করে বাংলায় মোগল বাদশাহী কায়েম করেন। মান সিংহ অনেক দিন বাংলার শাসনকর্তাও ছিলেন। মান-সিংহের বলে আকবরের বল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মান সিংহকে পেয়েছিলেন বলেই আকবর এত সহজে তাঁর বাদশাহী মসনদ গড়তে পেরেছিলেন। মান সিংহের যোগ্যতা বুঝে, মন বুঝে আকবর তাঁর হাতে বড় বড় কাজের, বড় বড় যুদ্ধের সৈন্য পরিচালনার ভার দিতেন। মান সিংহও সেই বিশ্বাস রেখে আজীবন সকল শক্তি দিয়ে আকবরের জন্যে লড়েছিলেন এবং তাঁকে বড় করে তুলেছিলেন।

আকবর মানুষ চিনতেন। যোগ্য লোক পেলে, বিশ্বাসী লোক পেলে, তিনি জাতি-ধর্মের বিচার করতেন না। তাঁর কাছে হিন্দু ছিল না। মুশলমান ছিল না। ভাল লোক দেখলে তাঁকে যাচাই করে নিয়ে, তাঁর যোগ্যতা

অনুসারে পদমর্যাদা দিতেন। মান সিংহ হিন্দু, সেই হিন্দুকে দিয়েই তামাম হিন্দুস্তানে তিনি তাঁর বাদশাহী মসনদ পাকা করে নিয়েছিলেন। মান সিংহ রাজপুত। সেই রাজপুতকে দিয়েই তিনি আরেক রাজপুত রাণা প্রতাপকে পর্যুদস্ত করবার জন্যে বার বার চেষ্টা চালিয়েছেন। তখন হিন্দুই হিন্দুর শত্রুতা করেছে বেশী। হিন্দু তেমন করে এদেশে হিন্দুর পাশে বুক বেঁধে দাঁড়ায়নি কখনও। সেই কারণে বুদ্ধিতে আর শক্তিতে এত বড় হয়েও এদেশের হিন্দুকে, বিদেশী পাঠান এবং মোগলের অধীন হতে হয়েছে। সংখ্যায় অল্প হয়েও পাঠান-মোগলেরা হিন্দুকে অধীনে রাখতে পেরেছে।

এই মান সিংহ একবার মেবারের অতিথি হয়ে এলেন। কোথাও যুদ্ধ করে তিনি দিল্লীতে ফিরছিলেন। মেবারের মধ্য দিয়ে পথ। উদয়পুরের কাছাকাছি এসে তিনি ভাবলেন একবার প্রতাপের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া যাক। প্রতাপকে তিনি সংবাদ পাঠালেন। প্রতাপ তখন কমলমীর দুর্গে। সংবাদ পেয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। মান সিংহ কমলমীরের দিকে গেলেন।

শত্রু হলেও অতিথি। প্রতাপ কমলমীর থেকে উদয় সাগরে গিয়ে মান সিংহকে অভ্যর্থনা জানালেন। মান সিংহ খুবই ক্লান্ত। ক্ষুধার্ত। উদয় সাগরের পাড়েই যাতে তিনি আহার করে বিশ্রাম করতে পারেন সেই ব্যবস্থাই করে দিলেন।

খাবার এল। মান সিংহও এলেন। মাত্র একখানি আসন। মান সিংহ বললেন ঃ রাণা মহাশয় কোথায় ?

প্রতাপের বড় ছেলে অমর সিংহ সেখানে দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন ঃ পিতা অসুস্থ।

মান সিংহ বুঝলেন যে, প্রতাপের এটা চালাকী। তিনি মোগলের ঘরে মেয়ে দিয়েছেন। মোগলের ঘর করেন। সেই কারণে প্রতাপ তাঁর সঙ্গে আহারে বসবেন না। তবুও তিনি প্রতাপকে একবার ডেকে আনতে অনুরোধ জানালেন।

প্রতাপ এলেন। তিনি বললেন ঃ আপনি মোগলের ঘরে মেয়ে দিয়েছেন। মোগলের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছেন। সুতরাং আমি আপনার সঙ্গে আহারে বসতে পারি না।

মান সিংহ জবাব দিলেন ঃ আমার নাম মান সিংহ। শীঘ্রই আপনার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।

প্রতাপ বললেন ঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে দেখা হলে আমি খুশি হব।

মান সিংহ দিল্লীতে ফিরলেন। আকবর সব শুনলেন। তারপর যুদ্ধের প্রস্তুতি। হলদিঘাট। এতবড় যুদ্ধ-সাজ আকবর আগে কখনও তৈরী

করেননি। সেলিম সেনাপতি। সেলিমের সঙ্গে মান সিংহ, সাগরজীর পুত্র মহাবৎ খাঁ।

মাত্র ২২ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রতাপ হলদিঘাটের যুদ্ধে নামলেন। প্রতাপ জানতেন যে, দুর্গম পাহাড়-পর্বতের মধ্যে থেকে গেরিলা আক্রমণ ছাড়া এত অল্প সৈন্য নিয়ে অত বড় সৈন্য-সজ্জাকে প্রতিহত করা অসম্ভব। এই পরিকল্পনা অনুসারে তিনি কমলমীর ও উদয়পুরের কাছে ঘন পাহাড়-পর্বতের মধ্যে আত্মগোপন করে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। আশপাশ সব খোলা জায়গা। আকবরের সৈন্যরা ধীরে ধীরে সেই খোলা জায়গায় এসে জমায়েত হলেন।

এবারে যুদ্ধ। প্রতাপের সঙ্গে দলে দলে রাজপুত আর ভীল সৈন্যেরা মোগলের ওপর এসে পড়তে লাগলো। প্রতাপ জানতেন যে, আকবর এত বলীয়ান হিন্দু-রাজপুতদের দ্বারা। হিন্দুরাই হিন্দুদের বড় শত্রু। রাজপুতরাই রাজপুতদের স্বাধীনতা আজীবন বিপন্ন করেছে। এরাই স্বদেশের এবং স্বজাতির শত্রু। তিনি মান সিংহকে ধরবার জন্যে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলেন। কিন্তু মান সিংহকে পাওয়া গেল না। চৈতক মারা গেল। প্রতাপ আহত অবস্থায় পেছনের দুর্গে সরে এলেন।

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধ হয়। প্রতাপ ২২ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিলেন। ১৪ হাজার প্রাণ দিল। ৮ হাজার প্রাণরক্ষা পেল।

প্রতাপ এরপর বার বার চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মোগলের আক্রমণে এক এক করে তাঁর সমস্ত দুর্গ আকবরের হাতে চলে গেছে। তখন তিনি রাজ্যহারা, সর্বহারা হয়ে চৌন্দের নিবিড় পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এইভাবে কয়েক বছর কাটলো। পরে ভীমাশা অনেক ধন, রত্ন নিয়ে প্রতাপকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। প্রতাপ ভীমাশাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিসিক্ত করেন। ভীমাশা রাণা প্রতাপের প্রধান মন্ত্রীর পদে যোগ দেন ১৫৭৬-এ. ডি.-তে। ভীমাশার পিতা রণথম্ভোর দুর্গের গভর্ণর ছিলেন। তখন উদয় সিংহের পিতা সংগ্রাম সিংহের রাজত্বকাল। ভীমাশা মস্ত যোদ্ধা ছিলেন। আকবর তাঁকে অনেক সম্মান দিয়ে নিজের রাজ্যে সম্মানীয় অতিথি করে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভীমাশা' সে প্রস্তাব প্রত্যাক্ষান করেন। চিতোর গড়ের প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশে ভীমাশা'র প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ তাঁর বীরত্বের সাক্ষী। ভীমাশা'কে তাঁর দানের জন্যে মেওয়ারের 'The Saviour of mewor' বলা হত। একসময় ভীমাশা' মেওয়ারের প্রধানমন্ত্রীও ছিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধের অনেক বীরের মধ্যে ভীমাশা'ও একজন। এমন একজন বীরকে পাশে পেয়ে এবং তাঁরই অর্থে

বলীয়ান হয়ে আবার নতুন করে পূর্ণ উদ্যমে প্রতাপ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

আবার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রতাপ কমলমীর দুর্গ এবং উদয়পুর সহ ৩২টি দুর্গ উদ্ধার করেন। একমাত্র চিতোর ছাড়া মেওয়ারের সমস্তই প্রতাপের হাতে এল।

এরপর আকবর প্রতাপের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে চাইলেন না। প্রতাপও বুঝলেন যে, এই বয়সে তাঁর পক্ষে চিতোর উদ্ধার করা আর সম্ভব নয়। শরীরে বল নেই। আশা নেই। আয়ু নেই। সুতরাং তিনি চিতোরের আশা ত্যাগ করলেন। উদয়পুরের পাশে পেশোলা হ্রদের পাড়ে চিতোরের দিকে মুখ করে বসে থাকতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর শেষ দিন ঘনিয়ে এল। তিনি তাঁর বড় ছেলে অমর সিংহকে ডেকে বললেন: রাণা কুলের মান-মর্যাদা, মেবারের গৌরব রক্ষার ভার তোমার ওপর রইল। তুমি একলিঙ্গের নামে, মা চতুর্ভুজার নামে, বাপ্পা সমরের নামে, হামীর-সঙ্গের নামে আমাকে স্পর্শ করে শপথ কর যে, তোমার শরীরে যে রক্ত আছে তাতে কোন কলঙ্ক আনবে না। আমার শাসিত মেবারে মোগলের প্রভুত্ব মেনে নেবে না। দেশের জন্যে আজীবন লড়াই করবে। দেশপ্রেমকে বড় করে দেখবে। এবং স্বজাতিকে রক্ষা করবে।

অমর সিংহ পিতার আজ্ঞা অনুসারে শপথ নিলেন। প্রতাপ সিংহ দেহ রাখলেন ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রতাপের পর স্বাভাবিকভাবেই অমর সিংহ রাণা হলেন। অমর সিংহের তেজ, বিক্রম, বীরত্ব তাঁর পিতার চেয়ে কিছু কম ছিল না। যুদ্ধনীতিও তাঁর বেশ ভালই জানা ছিল। পিতার সব গুণেই তিনি আয়ত্ব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আমলে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না। আকবরও আরাবল্লী অঞ্চল দখলে তেমন ইচ্ছুক ছিলেন না। অকারণ শক্তি ক্ষয়। ফলে দীর্ঘদিন কোন যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকায় অমর সিংহ অত্যন্ত আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এইভাবে প্রায় ১২ বছর কাটলো। এত দীর্ঘকাল বিলাস-ভোগ মেবারের পূর্বের কোন রাণার পক্ষেই সম্ভব হয়নি। অবশ্য এর জন্যে পরবর্তী জীবনে তাঁকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে।

অমর সিংহের রাণা হবার আট বছর পর আকবরের মৃত্যু হয়। সেলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে বাদশাহ হন। প্রথমদিকে নিজের রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা পাকা করতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। পরে সুযোগ বুঝে মেবার আক্রমণ করেন। দীর্ঘদিন আরাম-বিলাসে গা ভাসিয়ে অমর সিংহের এখন আর যুদ্ধের কোন প্রকার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু রাজ্যের সমস্ত সর্দার এবং মন্ত্রী পরিষদ তাঁকে রাণা প্রতাপের শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। যুদ্ধের জন্যে

প্রস্তুতি নেবার চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। এবং শেষে তাঁকে যুদ্ধে নামালেন।

প্রতাপ সিংহের মত অমর সিংহেরও তেজস্বীতা, বীরত্ব বা বিক্রম কিছু কম ছিল না। পিতার মত যুদ্ধনীতিও তাঁর বেশ ভালই জানা ছিল। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। সে যুদ্ধে তিনি জাহাঙ্গীরকে পরাস্ত করে সগৌরবে নিজের রাজ্যে ফিরে আসেন। পিতার শপথের কথা স্মরণ করে তিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করেন।

এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জাহাঙ্গীর কিন্তু একটুও ভাবিত হলেন না। ভাবলেন যুদ্ধের প্রস্তুতি আরো ভাল হওয়া দরকার। এই মাত্র। তিনি বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকলেন। পরে সুযোগ বুঝে আবার চিতোরের পার্বত্য অঞ্চল আক্রমণ করলেন। কিন্তু এবারেও পরাজয়। এবং বিচিত্র এই যে, এর পরবর্তী যুদ্ধেও তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। তখন জাহাঙ্গীর ভাবিত না হয়ে পারলেন না। জাহাঙ্গীরের অসুবিধা আর কিছুই নয়। আরাবল্লীর পার্বত্য অঞ্চল। গভীর অরণ্যানী। বিপদ-সঙ্কুল এবং সংকীর্ণ পথ-ঘাট আর নদ-নদী। সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। অথবা এগিয়ে গেলে আর ফিরে আসবার পথ পাবার স্থিরতা কিছু নেই। কারণ ঐ সব অঞ্চলের পথ-ঘাট তাঁদের জানা নেই। ওদিকে অমর সিংহের সমস্ত সৈন্যেরা অতর্কিত আক্রমণে অদ্বিতীয়। গেরিলা যুদ্ধে অভ্যস্থ। এইসব অসুবিধাই জাহাঙ্গীরের পরাজয়ের মূল কারণ। নতুবা জাহাঙ্গীরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং অসংখ্য সৈন্যকে প্রতিহত করা অমর সিংহের পক্ষে অসম্ভব ছিল। জাহাঙ্গীর এইভাবে ১৭টা যুদ্ধে অমর সিংহের কাছে পরাজিত হন। অমর সিংহ প্রতিবারই তাঁর পিতার শপথ স্মরণ করে নিজের রাজ্যের স্বাধীনতা ও স্বজাতিকে রক্ষা করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে এল। ধনবল, জনবল সব ফুরিয়ে এল। কোষাগার শূন্য। রাজ্যের মানুষ শূন্য। যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র শূন্য। কিন্তু ওদিকে মোগলের শক্তি অফুরন্ত। ধন, সম্পদ এবং অস্ত্র-শস্ত্র অফুরন্ত। সমস্ত রাজ্যের রাণারা অনেক আগেই মোগলের পক্ষে। অমর সিংহ ভেবে দেখলেন যে, এবারে যদি জাহাঙ্গীর অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে তবে তাঁর পক্ষে নিজের রাজ্য রক্ষা করা আর সম্ভব হবে না। কারণ দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালাবার মত রসদ তাঁর আর নেই। সেই কারণে তিনি সন্ধির সর্ত দিয়ে জাহাঙ্গীরের দরবারে দূত পাঠালেন। জাহাঙ্গীর প্রথমে এ প্রস্তাব বিশ্বাস করেননি। ভেবেছিলেন এ-সর্ত-পত্র অমর সিংহের লেখা নয়। কোন নকল পত্র। পরে খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, এ-পত্র স্বয়ং অমর সিংহের স্বহস্ত রচিত। পত্রে অমর সিংহ জানিয়েছিলেন যে, তাঁর পক্ষে যুদ্ধ চালানো আর সম্ভব নয়। তিনি বাদশাহের অধীনতা মেনে নিতে রাজী। তবে শারীরিক অসুবিধার জন্যে দরবারে আসতে পারবেন না। তাঁর পুত্র কর্ণ বাদশাহী

দরবারে হাজির থাকবেন। সন্ধি পত্র লেখা হল। তা'তে সর্ত থাকলো যে রাণা হবার আগে মেবারের যুবরাজ বাদশাহী দরবারে প্রয়োজন মত যাবেন। থাকবেন। কিন্তু রাণা হবার পর তাঁকে আর মোগল দরবারে যেতে হবে না। মেবারের রাণা কখনও মোগল দরবারে ওমরাহের আসনে বসবেন না। এ-সর্ত চিতোরের বীরত্বের নিদর্শন স্বরূপ দেওয়া হল।

এরপর অমর সিংহ আর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি উদয়-পুরের বাইরে পাহাড়ের ওপরে উদয় সিংহের পূর্বের সেই 'ন চৌকি'-র প্রাসাদে নির্জনে দীন ভাবে কাটাতেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি পুত্রকে ডেকে মেবারের গৌরবময় উজ্জ্বল দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ঃ আমি আমার পিতার কাছ থেকে স্বাধীন মেবার পেয়েছিলাম। চিতোর উদ্ধার আমার পিতার স্বপ্ন ছিল। তিনি সে স্বপ্নের রূপ দিয়ে যেতে পারেননি একথা সত্য। কিন্তু মেবারের পার্বত্য অঞ্চল আজীবন তাঁর দখলে ছিল। পিতার কাছে আমার শপথ ছিল, আমি আজীবন মাথা তুলে বেঁচে থাকবো। কারো কাছে পরাজয় স্বীকার করবো না। মেবারের পার্বত্য অঞ্চলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আজীবন লড়াই করবো। এবং স্বজাতিকে রক্ষা করবো। তুমি জানো আমি জীবনে ১৭ বার লড়াই করে আমার পিতার শপথ রক্ষা করেছি। এবং জয়ী হয়েছি। ৩২টা দুর্গ আমি আমার অধিকারেও এনেছিলাম। কিন্তু তারপর ক্রমাগত যুদ্ধে আমার রাজ্যের ধনবল, অর্থবল এবং লোকবল গেল ফুরিয়ে। দীর্ঘ-কাল যুদ্ধ চালানো আমার পক্ষে আর সম্ভব হল না। সেই কারণেই জীবনের শেষে এসে সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করতে হল। আমি আমার পিতার কাছ থেকে যে স্বাধীন মেবার পেয়েছিলাম, আজ আমার সেই মাতৃভূমির পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে তোমার হাতে তুলে দিলাম। যাবার আগে শুধু আশীর্বাদই করি যে তুমি যেন সে শৃঙ্খল মোচন করতে পার। মেবারের সে গৌরব আবার আনতে পার।

অমর সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে কর্ণ রাণা হলেন। রাজপুতদের জীবনে আর কোন যুদ্ধ নেই। পূর্বপুরুষরা অনেক যুদ্ধ করেছেন। এখন আর কোন যুদ্ধ নয়। শুধু সন্ধিপত্র অনুযায়ী দিল্লীর দরবারে হাজির থাকা। তিনি মেবারের পার্বত্য অঞ্চলের মহারাণা বটে তবে কোন স্বাধীনতা নেই। তাঁর জীবন এইভাবেই শেষ। তারপরে এলেন জগৎ সিংহ এবং শেষে রাজ সিংহ। রাজ সিংহ শাজাহানের আমলেই রাণা। জাহাঙ্গীর এবং শাজাহান এই দুই রাণাকেই ভালবাসতেন। এবং ভাল চোখে দেখতেন।

রাজপুত রাণারা অতীতে 'টীকাডোর' নামে একপ্রকার ব্রত পালন করতেন। এই ব্রতের নিয়ম ছিল রাণা অভিষেকের পরে রাজটীকা

ধারণ করে একদল সৈন্য নিয়ে কাছের কোন দুর্গ জয় করে ফিরে আসবেন। অতীতে তাঁরা এ ব্রত কঠোরভাবে পালন করতেন। এবং যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসতেন। কিন্তু শেষের দিকে রাণারা যখন দিল্লীর বাদশাহের অধীন তখন এ-ব্রত শুধুমাত্র একটা নিয়মে এসে দাঁড়িয়েছিল। আসলে তাঁরা যাত্রা করতেন ঠিকই কিন্তু কোন দুর্গ জয় হত না।

কিন্তু রাজ সিংহ অত্যন্ত তেজী পুরুষ ছিলেন। পূর্ব পুরুষদের তেজ, বীরত্ব, বিক্রম, এসব মোটামুটিভাবে তিনি বংশের দাবীদার হিসেবেই পেয়েছিলেন। সুতরাং এই শান্ত অভিষেক তাঁর ভাল লাগলো না। তিনি রাজটীকা ধারণ করেই একদল সৈন্য নিয়ে কাছের একটা দুর্গ সত্যি সত্যিই দখল নিলেন। যে দুর্গ ছিল মোগলের পরিপূর্ণ অধিকারে।

শাজাহানের কাছে নালিশ গেল। তিনি খবর শুনে একটু হাসলেন মাত্র। ভাবলেন ওটা একটা পাগলামী। বাদশাহী শাসন ঠিক রাখবার জন্যে আকবর যে সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ দেখিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ছেলে এবং নাতি জাহাঙ্গীর ও শাজাহান আজীবন সেই পথ ধরেই চলেছিলেন। এঁরাও আকবরের মত হিন্দু ও মুসলমানকে কোনপ্রকার ভিন্ন চোখে দেখতেন না। সেই কারণে বাদশাহীদের বড় সহায় ছিলেন রাজপুত। রাজপুতদের এঁরা আজীবন খাতির করে এসেছেন এবং সম্মানের চোখে দেখেছেন। দিল্লীর বাদশাহেরা জানতেন যে, এঁরা তেজী, বীর ও সুনিপণ যোদ্ধা। এঁদের হাতে রাখতে পারলে তামাম হিন্দুস্তান হাতে থাকবে। এঁদের দু'জনের মাতাই ছিলেন রাজপুত রমণী। সুতরাং রাজপুতের রক্ত যেমন এঁদের শরীরে ছিল তেমন রাজপুতদের ওপর রক্তের টানও ছিল। রাজপুত রাণারাও এঁদের ভালবাসতেন। বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাসী সামন্ত যেমন রাজার ভাল চায়। প্রাণ দিয়ে রাজার সেবা করে। রাজপুত রাণারাও তেমনই জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের মঙ্গল কামনা করতেন। সেবা করতেন। তখন রাজপুতেরা এমন সহায় ছিলেন যে, দেশ ভরা হিন্দু প্রজারা সুখেই ছিল। জাহাঙ্গীর এবং শাজাহানের আমলে রাজ্যে কোনপ্রকার গোলমাল বা উৎপাত ছিল না। দেশ-ভরা শান্তি ছিল। কিন্তু শাজাহানের শেষ আমলে মসনদ নিয়ে আবার নতুন করে গোলমাল শুরু হল। ঔরঙ্গজেব তাঁর অন্যান্য ভাইদের যুদ্ধে পরাজিত করে এবং পিতাকে বন্দী করে নিজে বাদশাহ হলেন। সেটা ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ।

আকবরের রাজত্বের ১00 বছর পরে ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব কাল সুরু। এই ১00 বছর তিন পুরুষ ধরে বাদশাহীদের যে সুন্দর নিয়ম চালুছিল, ঔরঙ্গজেব তা একেবারে পালটে দিলেন। তিনি গোঁড়া মুসলমান। পিতা-পিতামহের মত সরল এবং উদার মন তাঁর ছিল না। তাঁর মা ছিলেন

তাতার-কন্যা। রাজপুতদের ওপর যে রক্তের একটা টান সেটাও তাঁর ছিল না। বরং হিন্দুদের ওপর বিদ্বেষের ভাবই ছিল তাঁর বেশী। তিনি কড়া মুসলমান আইনে রাজ্য শাসনই নিজের ধর্ম বলে মনে করলেন। যে রাজপুতদের বলে আকবর বাদশাহী মসনদ গড়েছিলেন, যে রাজপুতদের বলে জাহাঙ্গীর আর শাজাহান তাঁদের বাদশাহী শাসন অমন সুন্দরভাবে রাখতে পেরেছিলেন, সেই রাজপুত যদি শত্রু হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাঁর বাদশাহী মসনদ ভেঙ্গে পড়তে পারে ঔরঙ্গজেব এ-কথা মনেও করলেন না। তার একমাত্র কারণ মুসলমান ধর্মের প্রতি তাঁর গোঁড়ামী মনভাব এবং তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ।

ফলে রাজ্যের সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমান আলাদা হয়ে যেতে লাগলো। মুসলমানেরা সম্মান বেশী পেতে লাগলো। হিন্দু ধর্মের ওপরও অত্যাচার আরম্ভ হল। এই অত্যাচারের চিহ্ন আজো আছে। কাশীর বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের মন্দিরের গায়ে একটা মসজিদ আজো আছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, একটা মন্দিরের মাথা ভেঙ্গে তার ওপরে মসজিদ গড়া হয়েছে। শোনা যায় ঔরঙ্গজেব জোর করে বিশ্বনাথের সেই মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ করেছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের আমলে দু'জন রাজপুত ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি ছিলেন। একজন মারাবারের রাজা যশোবন্ত সিংহ এবং অপরজন অম্বরের রাজা জয়সিংহ। এ-দুটি রাজবংশ আকবরের সময় থেকেই মোগল বাদশাহীর বড় বল। দু'জনেই তেজী এবং শক্তিমান। ঔরঙ্গজেব এঁদের খাতির করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু বিশ্বাস করতেন না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কারো বড় বেশী শক্তি দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি স্বস্তি না পেয়ে তাকে মারবার চেষ্টা করতেন বা দূরে কোন কঠিন যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতেন। যাতে সেখানে তার মৃত্যু হয়। ঔরঙ্গজেবের সব চেয়ে বড় সেনাপতি ছিলেন মীরজুমলা। এই মীরজুমলার বলেই ঔরঙ্গজেব তাঁর ভাইদের যুদ্ধে পরাজিত করে নিজে বাদশাহ হতে পেরেছিলেন। তিনি মীরজুমলাকে বড় ভয়ও করতেন। সেই কারণে তিনি তাঁকে আসাম জয় করবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ঔরঙ্গজেব এ-সংবাদে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল যশোবন্ত সিংহ এবং জয়সিংহের ওপরে। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, এঁদের সরাতে না পারলে তিনি ভালভাবে মুসলমানী আইন কায়েম করে রাজ্য চালাতে পারছেন না। সেই জন্যে যশোবন্ত সিংহকে তিনি কাবুল জয়ে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরও মৃত্যু হয়। যশোবন্তের রাণীর গর্ভে তখন এক সন্তান ছিল। যশোবন্তের মৃত্যুর পর রাণী সব বুঝতে পেরে তাঁর পুত্রকে রাণা রাজসিংহের কাছে পাঠিয়ে দেন। এবং এক পত্রে

রাজ সিংহকে জানান যে, তিনি তাঁর পুত্রকে রাজপুত হিসেবে মানুষ করবার আশা পোষণ করেন। রাণা রাজ সিংহ সেই পুত্রকে উদয়পুরে এনে মানুষ করেন এবং রাজপুত মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

মেবারের উত্তরে আরাবল্লীর পাশে রূপনগর বলে এক রাজ্য ছিল। তার রাজা ছিলেন বিক্রম শোলাংকি। বিক্রম শোলাংকির এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা ছিল। নাম প্রভাবতী। ঔরঙ্গজেব খবর পেয়ে তাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব পাঠালেন। শোলাংকি সে প্রস্তাবের কোন জবাব না দিয়ে গোপনে তাঁর কন্যাকে রাণা রাজ সিংহের কাছে পাঠিয়ে দেন। এবং বলে পাঠান যে, তাঁর আর্যবংশ কন্যাকে তিনি মুসলমানের হাতে দিতে অনিচ্ছুক। যদি রাজ সিংহের বিবাহে আপত্তি না থাকে তবে যেন তিনি তাঁর কন্যাকে দাসীরূপে গ্রহণ করেন। রাজা বিক্রম শোলাংকি রাজ সিংহের কাছে যে প্রস্তাব পাঠালেন, সে খবর ঔরঙ্গজেবের কাছে পেঁছুতে বেশী সময় নিল না। তিনি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। তারপরেই ডাক পড়লো প্রধান প্রধান সেনাপতি আর সৈন্যদের। তিনি আরাবল্লী পর্বতের নীচে সৈন্য সাজিয়ে ফেলতে হুকুম দিলেন।

যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলের গেরিলা যুদ্ধে মোগলেরা এঁটে উঠতে পারলেন না। রাজপুত সৈন্যেরা মোগলদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে লাগলেন। মোগল সৈন্যদের ঐ গিরি-অঞ্চলের পথ-ঘাট জানা নেই। একবার গভীর অরণ্যে অথবা পর্বত-চক্রে ঢুকে পড়লে আর ফিরে আসবার পথ পাওয়া অসম্ভব। এবং যোগাযোগ রক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই হতাহতের সংখ্যা অনেক। শেষ পর্যন্ত মোগল সৈন্যদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে হল। রাজ সিংহ বিজয় গৌরবে প্রভাবতীকে উদয়পুরে নিয়ে এলেন। সেখানে রাজ সিংহের গলায় মাল্যদান করলেন প্রভাবতী।

দিল্লীতে সংবাদ গেল। ঔরঙ্গজেব রাগে এবং অপমানে প্রতিশোধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। ঠিক করলেন মেবারের পার্বত্য অঞ্চল, নগর, গ্রাম এবং দুর্গ ভেঙ্গে এবং আগুন জ্বালিয়ে শেষ করে দেবেন। মেবারের ছবি তামাম হিন্দুস্তান থেকে মুছে ফেলবেন। নইলে এই বাদশাহী মসনদে বসবার তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি বিপুল শক্তি নিয়োগ করে আয়োজন সুরু করলেন।

রাজ সিংহের আয়োজন যদিও ঔরঙ্গজেবের সমতুল্য নয়, তবুও নিতান্ত কিছু কম ছিল না। মারাবার এখন মেবারের পক্ষে। তাছাড়া ছোট-বড় রাজপুত রাজারাও এখন রাজ সিংহের দলে। রাজ সিংহ স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্যে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। মহারাণা সংগ্রাম সিংহের পর

যুদ্ধের এতবড় প্রস্তুতি দীর্ঘকাল আর হয়নি। মেবারের রাণা রাজ সিংহ হিন্দু রাজপুত শক্তির নায়ক হয়ে মুসলমান বাদশাহী শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁর সৈন্যবল, অর্থবল, অস্ত্রবল ও রসদবল মোগলের সমতুল্য নয়। কিন্তু তবুও দেশ প্রেমের আদর্শ এবং নিজের রাজ্যরক্ষার দায়িত্ব তিনি জীবন দিয়ে পালন করবেন। তিনি সৈন্যদের এই মন্ত্রেই দীক্ষা দিতে লাগলেন।

রাজ সিংহ মেবারের সমভূমি রক্ষা করবার কথা চিন্তা না করে সমস্ত শক্তি নিয়ে আরাবল্লীর গভীরে আশ্রয় নিলেন। পার্বত্য অঞ্চলের ভীলরাও রাজ সিংহের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁদের দেশপ্রেম এবং যুদ্ধনীতি তুলনাহীন। রাজ সিংহের দুই পুত্র। জয় সিংহ এবং ভীম সিংহ। দু'জনেই বীর। এবং যুদ্ধনীতিতে অপূর্ব কৌশলী। রাজ সিংহ সৈন্যদের তিন ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগের সেনাপতি করলেন জয় সিংহকে। তাঁর ওপর দায়িত্ব দিলেন গুজরাট অঞ্চলে মোগলদের চলাচল বন্ধ করে দেবার। আরেক ভাগের সেনাপতি করলেন ভীম সিংহকে। তাঁর দায়িত্ব হল মোগলদের পার্বত্য অঞ্চলের ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করা। এবং মোগলদের সুযোগমত সাঁড়াশী অভিযানে ঘিরে ফেলা। শেষ ভাগের দায়িত্ব নিলেন তিনি নিজে। তিনি আরাবল্লীর জটিল গিরিপথের এমন জায়গায় ঘাঁটি গাড়লেন যেখানে মোগল সৈন্যদের আসতেই হবে।

ঔরঙ্গজেব প্রথমে মেবারের সমভূমিতে ঘাঁটি গাড়লেন। পরে ধীরে ধীরে সৈন্য নিয়ে গিরিপথের গভীরে ঢুকতে চেণ্টা করতে লাগলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, এখানেই তিনি বাধা পাবেন। কিন্তু কোন বাধাই তিনি পেলেন না। তিনি সৈন্য নিয়ে যেমন এগিয়ে যেতে লাগলেন, রাজপুত সৈন্যরাও ধীরে ধীরে পার্বত্য অঞ্চল ঘিরে ফেলতে লাগলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এগিয়ে আসতে আসতে এক আকাশ-প্রমাণ পাহাড়ের গায়ে বাধা পেলেন। আর এগিয়ে যাবার কোন পথ নেই। তিনি পিছিয়ে আসবার হুকুম দিলেন। কিন্তু পিছিয়ে আসবার পথও বন্ধ। রাজপুত সৈন্যেরা পথ আটকে বসে। রাজ সিংহ তাঁর সমস্ত সৈন্য একত্রিত করে ঐ গিরিমুখে এনে সমবেত করলেন। কিন্তু কোনপ্রকার যুদ্ধ করলেন না। তাঁর ইচ্ছা মোগল সৈন্যদের আটকে রেখে রসদ শেষ করে দেওয়া। যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া। তাঁদের মূল শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে আনা। রাজ সিংহ এই যুদ্ধে সেনানায়ক হিসেবে যে নিপুণ বুদ্ধি, যুদ্ধনীতি এবং কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন ইতিহাসে তা বিরল।

বেশ কয়েকদিন এই ভাবে কাটলো। সমস্ত সৈন্যদের রসদ বন্ধ। কোন খাবার নেই। জল নেই। হাতী, ঘোড়া যুদ্ধের সমস্ত আয়োজনই আটকা

পড়ে। এমন বিপদে ঔরঙ্গজেব জীবনে কখনও পড়েননি। জীবনে অনেক যুদ্ধ তিনি করেছেন। কিন্তু এমন অসুবিধায় আগে তাঁকে কখনও পড়তে হয়নি। তিনি শেষে উপায়হীন হয়ে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। সন্ধি হল। এই যুদ্ধের বেশ কিছুদিন পর রাজ সিংহ মারা যান।

জয় সিংহের পরে আরো ৭ জন রাজপুত মেবারের রাণা হন। তখন মোগল বাদশাহী শক্তি শেষ হয়ে এসেছে। ঔরঙ্গজেবের আমলের সে তেজ, বিক্রম আর নেই। ঔরঙ্গজেবের পর যাঁরা বাদশাহ হন, তাঁরা সকলেই ভোগ-বিলাসে অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন। তাঁদের রাজ্য শাসন, রাজ্য বিস্তার বা ব্যক্তিত্ব এসব কিছুই ছিল না।

এই সময়ে মারাঠা শক্তি বাড়তে থাকে। শিখেরা অত্যাচারিত হয়ে যুদ্ধে নামে। দেশভরা তখন অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা। ভারতের পশ্চিমভাগে যেমন মারাঠা, তেমন পূর্বভাগে ইংরেজ বড় শক্তি হিসেবে পরিচিত হতে সুরু করে। পরে নানা সংঘাতের মাধ্যমে মারাঠা শক্তি ইংরেজের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

রাজ সিংহের পরে এইভাবে ধীরে ধীরে ১00 বছর অতিক্রান্ত হতে থাকে। ইতিহাস আপন কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে নয়া ইতিহাস রচনার কাজ সুরু করে। মহাকাল তার বিচিত্র পথ ধরে এগিয়ে আসতে থাকে। ভারতের পট পরিবর্তন হতে থাকে। তারপরেও অনেক রাণা মেবারের গদীতে বসে বীর্যহীন, শক্তিহীনভাবে জীবন কাটিয়ে গেছেন। ইংরেজের গোলামী করেছেন। নজরানা পাঠিয়েছেন। আর তাঁদের বংশের গৌরবময় অধ্যায়ের কথা স্মরণ করেছেন।

ইতিহাসের পথ ধরে ধরে ১৮১৭ সাল এগিয়ে এসেছে। মারাঠা জাতি ইংরেজের কাছে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় নিয়েছে। তার পরের বছরই অর্থাৎ ১৮১৮ সালে জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে ইংরেজের সঙ্গে রাজপুত রাণাদের সন্ধি হয়েছে। সন্ধির সর্ত : ইংরেজ আশ্রয় দাতা। রাজপুত আশ্রিত। ইংরেজ প্রভু। রাজপুত রাজার অধীন। সন্ধিপত্র পাকা এবং সহি।

মেবার-চিতোরের দীর্ঘদিনের যুদ্ধ, তেজ, বীরত্ব, দেশপ্রেম, দেশপ্রীতি এবং স্বদেশরক্ষার ইতিহাস ইতিকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোদিত লিপি এবং পাণ্ডুলিপিতে জরাবদ্ধ হয়েছে।

চিতোর গড়ে স্থাপত্যবিদ্যার নিদর্শন স্বরূপ অনেক প্রাসাদই দেখতে পাওয়া যায়, তার মধ্যে "আলকা কাবরার" প্রাসাদও একটি। এ-প্রাসাদের স্থাপত্যবিদ্যা হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত। এ-প্রাসাদের পরেই পাওয়া যাবে "শৃঙ্গার চৌরী" এটা একটা জৈন মন্দির। এ-মন্দিরে প্রবেশের দুটি

দরজা। এখানে ২৪ জন জৈন তীর্থংকরের মূর্তি আছে। সম্ভবতঃ এ-মন্দির তৈরী হয় 1303 A.D.-তে। এ-মন্দির থেকে একটু এগিয়ে গেলেই ফেজসিং-এর মহল পাওয়া যাবে। এ মহলের তৈরী কাল 1307 A.D.-তে। খরচা পড়েছিল ছ'লাখ টাকা। তিনি ৪৫ বছর এখানে রাজত্ব করেছিলেন কিন্তু কোনদিন দরবার করেননি। এ-প্রাসাদ ও স্থাপত্যবিদ্যার একটি নিদর্শন।

চিতোরে এসে মীরাবাঈকে বাদ দেওয়া যাবে না। অতীতে মীরাবাঈ যেমন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহিলা ছিলেন। তেমন এখনও আছেন। তাঁর জীবনে তিনি কৃষ্ণসাধনা করেছেন, সংগীত রচনা করেছেন। সুর দিয়েছেন। গান গেয়েছেন এবং সবশেষে চিতোরের রাজনীতিতে স্বকীয় অংশও নিয়েছেন। অনেক যুদ্ধের হাত থেকে তিনি চিতোরকে বাঁচিয়েছেন। উদয় সিংহকে বনবীরের হাত থেকে পান্নাবাঈ যে বাঁচিয়েছিল, তার পেছনে মীরাবাঈ-এর অবদান অনেকখানি। মীরাবাঈ-এর জন্ম মেড়তার কুড়কী গ্রামে। তিনি রতন সিংহের কন্যা। চিতোরের মহারাণা সংগ্রাম সিংহের বড়ছেলে ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় 1516 A.D.-তে। চিতোরে মীরাবাঈ-এর সবচেয়ে বড় অবদান বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার। চিতোরে রাণারা ছিল কালিকা দেবীর পূজারী। একলিঙ্গেশ্বর তাঁদের গৃহ দেবতা। তাঁরা শক্তির উপাসক। কিন্তু এই শক্তি পূজার মধ্যেও মীরাবাঈ চিতোরে অনেক কৃষ্ণ মন্দির তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মীরাবাঈ-এর মূল আদর্শ ছিল সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ ও ভক্তিবাদ। মীরাবাঈ আসবার আগে চিতোরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ তেমন হয়নি। চিতোরে এ-ধর্মের প্রবক্তা মোটামুটিভাবে মীরাবাঈ। অবশ্য তাঁর এ-কাজে সহযোগীতা করেছেন মীরাবাঈ-এর শ্বশুর ও স্বামী।

মহারাণা সংগ্রাম সিংহ এবং তাঁর বড়ছেলের মৃত্যুর পর মহারাণার দ্বিতীয় পুত্র চিতোরে রাণা হন। তিনি ঘোর শক্তি-পূজারী ছিলেন। ফলে মীরাবাঈ-এর সঙ্গে তাঁর মনমালিন্য সুরু হয়। শেষে তিনি মীরাবাঈকে নানাভাবে উৎপীড়িত করতে থাকেন এবং বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করেন। মীরাবাঈ তখন চিতোর ত্যাগ করে একাগ্র মনে কৃষ্ণ ভজনার জন্যে বৃন্দাবনে চলে যান। তিনি রুহিদাসের শিষ্যা ছিলেন। চিতোর গড়ে ভক্ত রুহিদাসেরও একটা মন্দির আছে। বিক্রমাজিতের মৃত্যুর পর পরবর্তী রাণা উদয় সিংহ মীরাবাঈকে আবার চিতোরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু মীরাবাঈ আর ফিরে আসেননি। মীরাবাঈ-এর কৃষ্ণভক্তি ইতিহাসে বিরল। শোনা যায় তিনি কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন মীরাবাঈ

দ্বারকায় কৃষ্ণ বিগ্রহে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। আবার অনেকে বলেন তিনি অনন্ত মিশ্রের অনসন (উদয় সিংহ অনন্ত মিশ্রকে পাঠিয়ে ছিলেন মীরাবাঈকে চিতোরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে এড়াবার জন্যে কৃষ্ণ মন্দিরের পেছনের ছোট কুঠরী দিয়ে গোপনে অন্যত্র চলে যান। মীরাবাঈ যদি কৃষ্ণ বিগ্রহে বিলীন না হয়ে থাকেন, তবে সেই সময় থেকেই তাঁর অজ্ঞাত বাস সুরু। এরপর তাঁকে প্রকাশ্যে আর কেউ দেখতে পাননি। তাহলে তাঁর মৃত্যু ঘটে লোকচক্ষুর অন্তরালে এবং অপ্রকাশ্যে। মীরাবাঈ-এর জন্মস্থান কুড়কী গ্রামে যেমন মীরাবাঈ-এর মন্দির আছে, তেমন চিতোর গড়েও মীরাবাঈ-এর মন্দির আজো শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলে স্মরণ করে। মীরাবাঈ অতীতে তাঁর গানে যেমন আসমুদ্র হিমাচল প্লাবিত করেছিলেন, আজও তাঁর গান ঠিক তেমনভাবেই গাওয়া হয়ে থাকে। মীরবাঈ তাঁর গানের জন্যেই বিখ্যাত হয়ে আছেন। কবীর, নানক, সুরদাস, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে ভক্তিবাদ ও সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের কথা বলে গেছেন, মীরাবাঈ সেই একই আদর্শের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছেন।

মীরাবাঈ-এর বিখ্যাত গানের মধ্যে একটি ঃ

"মেরে প্রীতম প্যারে রামনে
লিখ ভেজুঁ রী পাতী
স্যাম সনেসো কবহুঁন দীন্হো
জান বুঝ শুক বাতী।
ঊঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহারীঁ
রোয় রোয় আঁখিয়াঁ রাতী
তুম দেখ্যা বিন কল ন পরত হৈ
হিয়ো ফটত মোরী ছাতী
মীরা কে প্রভু কবরে মিলোগে
পুরব জনম কে সাথী ॥"

[সখি, আমি আমার প্রিয়তমকে পত্র লিখবো। আমার সকল গোপন কথা জেনে শুনেও তিনি আমাকে কখনোই খবর দেবেন না। মহলের ওপরে চড়ে তাঁর পথের দিকে চেয়ে আছি। কেঁদে কেঁদে আমার চোখ লাল হয়ে গিয়েছে।

হে প্রিয়, তোমাকে না দেখলে যে শান্তি মেলে না। আমার বুক যে বিদীর্ণ হয়ে যায়।

হে পূর্বজন্মের সাথী, মীরার প্রভু, আর কেন দেরী কর। কবে আমার সঙ্গে মিলিত হবে।]

মীরাবাঈ-এর গান সারা ভারতে জনপ্রিয় ছিল এবং এখনও আছে।

মীরাবাঈ 'মল্লার রাগ' নামে একটা রাগ সৃষ্টি করেছিলেন। একজন লেখক মীরাবাঈ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন :

"There are some strong and special bonds during the middle ages that knit Rajputana and Bengal. This is shown in the anxiety of Rajput princes, for the recovery of Gaya from the musalmans. No history of vaishnavism can be completed, if it does not on the one hand account for its own differences as between Bengal and other provinces and on the other explain the Chaitanya-like personality of Mirabai. The insperation of her songs bind the people of this Country into one unit.

Therefore, Mira plays, even upto this day a great role of social and emotional integration of our country by her devotional songs."

রাণা কুম্ভের "জয়স্তম্ভ"-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই 'জয়স্তম্ভের' দক্ষিণ-পশ্চিমে রাণা মুকুলজির মন্দির। ১১ শতাব্দীতে তৈরী। এই মুকুলজির মন্দিরকে ঘিরে আছে মহাসতী শবদাহ স্থান। শোনা যায় বাহাদুর শাহের আক্রমণ কালে উদয় সিংহের মা কেরামতন বাঈ (মহারাণা সংগ্রাম সিংহের তৃতীয় স্ত্রী) ১৩,০০০ জন মহিলাসহ এখানে 'জহরব্রত' পালন করেন। এ-সমস্ত জায়গাটা মোটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। তিনটে সুন্দর গেট আছে। উঁচু পাহাড়ের এক মনোরম জায়গায় এটি স্থাপিত।

এখান থেকে একটু এগিয়ে গেলেই চোখে পড়বে জয়মল ট্যাঙ্ক। পাশেই জয়মলের প্রাসাদ। জয়মল মীরাবাঈ-এর জ্যেষ্ঠতাতের পুত্র। জয়মল মীরাবাঈ-এর সম্পর্কে ভাই। এঁদের দু'জনেরই দাদু ছিলেন দুদা। দুদার হাতেই এরা মানুষ। কারণ জয়মলের পিতা বীরম দেবজী ও মীরাবাঈ-এর পিতা রতন সিংহ চিতোরের রাণা সংগ্রাম সিংহের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ছিলেন। এঁরা দুজনে আবার War Council-এরও সদস্য। চিতোরের প্রায় সমস্ত যুদ্ধেই এঁদের জড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। ফলে মীরাবাঈ এবং জয়মল মানুষ হ'ত তাঁদের দাদু দুদার কাছে। দুদা এঁদের দুজনকেই সমানভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা থেকে সুরু করে সংগীত, সাহিত্য, ইতিহাস এবং তৎকালীন রাজনীতিতে এঁদের পারদর্শী করে তুলেছিলেন। বীরম দেবজীর মৃত্যুর পর জয়মল মেড়তার রাজা হন। আকবর চিতোর আক্রমণ করলে তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। আকবর

জয়মলের সাহসীকতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। জয়মলের প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল 1568 A.D.-তে। এ-প্রাসাদে মুসলমান স্থাপত্যবিদ্যাই বেশী চোখে পড়ে।

চিতোর গড়ে বেড়াতে এলে ন'লক্ষ ভাণ্ডারে একবার চোখ রাখতেই হবে। চিতোরের এত যুদ্ধ বিগ্রহ, বীরত্ব, চিতোর গড় নিয়ে এত মারামারি, আর চিতোর গড়ের, সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকথা, স্থাপত্যবিদ্যা এবং অপর দিকে রাজমহিষী ও রাজপুত্তদের বিলাস-বৈভবের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এই ন'লক্ষ ভাণ্ডার। তৎকালে এখানে চিতোর গড়ের রাণাদের সমস্ত ধন-দৌলত সোনা-দানা, হীরে-জহরৎ ও নানা ধরনের প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র এবং দলিল জমা থাকতো। এটাকে বলা হত 'Treasury Building', এখানে ন'টা কোঠা আছে। তৈরী করতে সেই সময়েই ন'লক্ষ টাকা পড়েছিল। নিঃসন্দেহে ভারী মজবুত। চারপাশে কামান বসানো। সবচেয়ে বড় কামানের দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট এবং বেড় ৭ ইঞ্চি। সামনে বাগান। এই ন'লক্ষ ভাণ্ডার সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> "Three circular baston, with Vaulted chamber, built in Sixteenth Century, to keep the treasure of Mewor, which is believed to contain nine lakh Rupees, at a time."

এর পরেই আসবে তোপখানা। এবং তোপখানা পেরিয়েই আসবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রস্তর মূর্তি। এই প্রস্তরমূর্তি সম্পর্কে একজন লেখক বলেছেন :

> "Near the Topkhana, is a roofless enclosure in and before which are lying some ten miniature Buddhist stupas, curved in stone. These were found from eastern margin of Patta Jaimal's Tank. The larger ones stand out 3 feet inches high and are one foot eight inches square at the base. They are all of one pattern. The upper portion is cylindrical, with domed top, from which a Tee (Tee is a square top most part or capital of Buddhist stupa) must have arisen as the small fracture of the neck is apparent upan all. No Tee, however, was found. Around the bare of the cylindrical point is a string cause of 16 little seated Buddhas, each in a little niche. Beneath this, is a constructed circular neck with lotus leaves springing from it, and an upword row to downword row. Beneath this, again the stupa is square, with projecting niches, one on each face in each of which is the image of Buddha.

There are three distrinct poses viz ; the meditative, the witness and the teaching attitude. Beneath each of these is a symbol incised the most frequently acourring one being a well formed Vajra. There is no spreading basement. The stupas are all a good deal wather-worn that the finer detail of the curving is lost. The hair is apparently not curly but long and is done up into a considerable knot on the top of the head, two of these have broken and rest have been damaged. A stone bull was also found with them which shows that they were sometimes worshipped as 'Lingam of Shiva.' "

চিতোর গড়ে এলে সহজেই বোঝা যায় যে, এখানকার রাণারা শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন না। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও স্থাপত্যবিদ্যার ওপরও উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। সেই কারণেই চিতোরের রাণার এই দুর্গকে নানা শিল্প এবং স্থাপত্যে সাজিয়েছিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যুদ্ধে সে-সব নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও মানুষ চিতোর গড় বলতে যে ধারণা পোষণ করতো তা' পাল্টায়নি। এই দুর্গে সমস্ত স্থাপত্য নিদর্শন বাদ দিলেও নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর জলাশয়, ঝর্ণা ও কূপ আছে। মোটামুটিভাবে এই চিতোর গড়ে জলাশয় আছে ৮০ থেকে ৮৪টা। এখানকার স্থাপত্যবিদ্যা এত মনোরম যে, বিদেশ থেকে নানা শিল্পী এ দুর্গ দেখতে আসে। এক সময় এই দুর্গকে সাজাবার জন্যে ১৮ জন বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পী নিয়োজিত ছিল। অতীতে এখানে একটি শিল্প-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানও পরিচালনা করা হত। এখানকার শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যা দেখলে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাণারা তাঁদের রাজত্বকালে এই দুর্গকে নানাভাবে সাজাবার চেষ্টা করেছেন। গুপ্ত যুগের কিছু নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। বুদ্ধ-শিল্পের অনেক জিনিস এখানে আছে। রাণা লাক্ষা তাঁর রাজত্বকালে এই চিতোরকে বিশেষভাবে সাজিয়েছিলেন। রাণা কুম্ভের সময়েই চিতোর গড়ে শিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠ সময়। এইসব স্থাপত্যবিদ্যায় বুদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের ছাপ দেখা যায়।

চিতোর গড়ের রাণাদের একদিকে যেমন যুদ্ধবিগ্রহে দিন কাটাতে হয়েছে আবার তেমন দীর্ঘকাল সুখে-শান্তিতেও কাটিয়েছেন। তার নিদর্শন হচ্ছে সৌন্দর্যময়ী রাজপ্রাসাদগুলো এবং অতুলনীয় দেব-মন্দির ও কীর্তি স্তম্ভমালা। এক একটা কীর্তিস্তম্ভ তৈরী করতে এ-রাজ্যের এক বছরের সমস্ত আয় ব্যয় হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে দশ বৎসরের আয়েও এমন একটা

কীর্তিস্তম্ভ তৈরী করা সম্ভব নয়। চিতোর বার বার আক্রান্ত হবার ফলে এখানকার সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র ভীম সিংহ ও পদ্মিনীর বিলাস-গৃহ অক্ষত ছিল।

চিতোরের রাণারা এই শিল্প ও স্থাপত্যে এত অর্থ ব্যয় করবার পরও বিরাট সেনাদলের ব্যয়ভার বহন করতেন। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, এখানকার রাণারা অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন এবং প্রজারা রাণাদের পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করতো। তারই ফলে এইসব অতুলনীয় কীর্তিমালা তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল। এখনো চিতোরে যা অবশিষ্ট আছে, সেই অবশিষ্ট সৌন্দর্য ও রাজভক্ত প্রজা ও প্রজাবৎসল রাণাদের মহিমা প্রচার করছে। এই নিদর্শন থেকেই প্রমাণ হয় যে, যত্ন-প্রচেষ্টায় সব কিছুই সম্ভব।

W. Noman Brown রাজপুত চিত্র-কলা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

> "The swetamber paintings of Gujarat and later Rajputana are the mother which the Parsian styles inpregrated to produce types, now known as Rajput."

আগেই বলা হয়েছে যে, এখানে সকল ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। জৈন, বুদ্ধ, বৈষ্ণব, শিব ও শাক্ত এইসব ধর্মের মন্দির পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তবু চিতোরের রাণারা ছিলেন শিব-শক্তির উপাসক। যুদ্ধের সময় এঁরা 'হর হর মহাদেব' বলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এখানে সূর্য-দেবতার যে মন্দির আছে সেটা মনে হয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো।

এক সময় চিতোরে সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়েছিল। সিদ্ধ সেন সেই সময়ে একজন নামী দার্শনিক, বক্তা ও সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। হরিভদ্র সুরীও একজন নামী দার্শনিক ও সুলেখক। তিনি সর্ববিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি। ১৪৪৪ খানা গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। জৈন সাহিত্যে এতবড় লেখক এবং পৃষ্ঠপোষক বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর পরে আরো অনেক সাহিত্যিকরা জৈন ধর্মের ওপর সাহিত্য রচনা করে গেছেন। এখানে অনেক সাধুকে জৈন ধর্মের সাহিত্য নকল করে সাধুদের মধ্যে প্রচারের জন্যে নিয়োগ করা হত।

> "Hence everything shows that the Jain faith was once predominant and their arts, like their religion, were of a character quite distinct from those of Shiva."

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন যে, চিতোরে এত শিল্প, সাহিত্য, কলা ও স্থাপত্যবিদ্যার উন্নতির মধ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্যেও কিন্তু একটুও পিছিয়ে ছিল না। অতীতে চিতোর একটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। এখান

থেকে বিদেশে মাল চালান যেত। এখানে অনেক ব্যবসায়ী ও বণিকেরা বাস করতো এবং বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা চালাত। অতীতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও চিতোর সমৃদ্ধ ছিল।

চিতোর গড়ে পৌঁছুবার নির্দেশমালা মোটামুটিভাবে নীচে দেওয়া হল :

"The Ascent, which begins from (within) the South-East angle of the Town, is nearby a mile to the upper gate with a slope of about 1 in 15. There are two Zig-Zag bends, and on the portions then formed are seven gates. From the gate at the foot, known as the Padan pol, the first portion runs North for 1050 yards passing through the Bhairav Pol, and the Hunuman Pol to the first bend. Here the Second portion of 235 yards begins, and turning south at once passes through the Ganesh Pol and continues to the Jorla Pol, just before the second bend.

At this point, the third portion of 280 yards, which turns again to the North, commences and directly after leaving the bend passes through the Lakhsman Pol, continuing then to the upper or main gate, the Ram Pol."

চিতোরের সামনেই একটা ঝর্ণা আছে। যাকে Manucci, an Italian and chief Physician of Aurangzeb calls it—"A rivulet of the best water in the world." এখানে দুটি চাঁট আছে। একটি জয়মলের ও অপরটি কলার-এর। আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে এঁদের মৃত্যু। আকবর জয়মলের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে এখানে তাঁর একটি মর্মর মূর্তি তৈরী করেন। সেই সময়ে এই যুদ্ধে 30,000 রাজপুত ও সিভিলিয়ান নিহত হন। এই যুদ্ধ ঘটেছিল 1303 A.D.-তে। এর পরেই আসছে রাম পোল, রামায়ণের রামচন্দ্রর নামে। রাম পোলের স্থাপত্যকার্য অতীব সুন্দর।

"Outside Ram Pol, there are Several inscription. One the right leaving against a chabutra there are three inscribed stones and a similar one on the left against the wall. There are inscriptions on the stone of the wall it-self on both sides of the gateway, three on the right or South side and as many on the left. Thus there are ten inscription in all, of which four are dated 1832, 1833, 1833 and 1835 V.S. (1775, 1776, 1776 and 1778 A.D.) of the time of

Maharana Hamir Singh II, one dated 1678 V.S. (1621 A.D.) of Maharana Karan Singh, one of the Bhim Singh, one of Maharana Udai Singh and three of Banvir, two of which are dated 1593, 1595 V.S. (1536, 1538 A.D.)"

রাম পোল থেকে বেশ কিছু পথ এগিয়ে গেলে চিতোরের মাঝে মানস সরোবরের তীরে মরিরাজগণের সংস্থাপিত স্তম্ভ-গাত্রের খোদিত লিপি আপনার চোখে পড়বে। এই খোদিত লিপি আজকের যুগের মানসিক ভাবনা থেকে কত পার্থক্য তা' বোঝবার জন্যেই নীচে সেই খোদিত লিপির নকল দেওয়া হল ঃ

'জলপতি বরুণদেবের দ্বারা আপনি পরিরক্ষিত হউন। যে নীরনিধি তীরস্থ মধুপূর্ণ লোহিত সুফলরাজি পরিশোভিত বৃক্ষাবলীতে মধুমক্ষিকা-দল বিহার করিতেছে, যে বারিধি হইতে শতশত শাখা তরঙ্গিনী উৎপন্ন হইয়া, যাহার সুষমা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে, এ জগতে সে জলধির উপমাস্থল আর কি আছে ?

যে জলধি পারিজাত (১) গন্ধে আমোদিত—যে সমুদ্র কর স্বরূপ সুরা, রত্ন এবং অমৃত প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সমুদ্র আপনাকে রক্ষা করুন।

ইহা একটি মহাবদান্যতার স্মারক চিহ্ন। এই সরোবর দর্শক মাত্রেরই নয়ন বিমুগ্ধ করে। ইহার সুবিস্তৃত বক্ষোপরি নানা জাতীয় জলচর পক্ষী মহানন্দে জলক্রীড়া করিয়া থাকে এবং ইহার তীরভূমি প্রত্যেক প্রকার পাদপাবলীতে পরিশোভিত। অভ্রভেদী শিখর শির হইতে নিপতিত হইয়া, প্রাকৃতিক রমণীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ পূর্ব্বক এই সরোবরে তরঙ্গ আসিয়া, প্রবল বেগে পতিত হইতেছে। সর্পরাজ মাতোলী (২) সমুদ্র মন্থনের পর পরিক্লান্ত চিত্তে এই সরোবরে বিশ্রামার্থ আশ্রয় লইয়াছেন।

এই মেদিনী মণ্ডলে মহেশ্বর (৩) নামে এক মহাবলশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে, তাঁহার কোন শত্রুর নাম কোথাও শ্রুত হওয়া যায় নাই। তাঁহার গৌরব গরিমা অষ্টদিকে পরিব্যপ্ত হইয়াছিল। জয়লক্ষ্মী তাঁহার বাহুর উপর আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি জগতের সমুজ্জ্বল শশির ন্যায় ছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা নিজমুখে তস্থ (৫) জাতির প্রশংসা বিঘোষিত করেন।

রাজা ভীম (৬) কামদেবের ন্যায় পরম সুন্দর এবং পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি শত শত পঙ্কজ মধ্যে জলবিহার কালে রাজহংস দিগকে স্বহস্তে আহার্য্য প্রদান করিতেন। তাঁহার মধুরিম মূর্ত্তি হইতে যশঃ কিরণ উদ্ভাষিত হইত। সেই রাজা ভীম, সংগ্রাম সমুদ্রের একজন সুকুশলী সন্তরণকারী ছিলেন,

এমনকি যে স্থলে পবিত্র তোয়া গঙ্গা নিজ তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন (৭) তিনি সেই দূরবর্ত্তী স্থানও জয় করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার রাজধানী অবন্তী (৮)। তিনি নিজ অরাতিগণের যে সমস্ত স্ত্রী-কন্যাদিগকে হরণ করিয়া আনিতেন, যে রমণীগণের মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় কমনীয়, যে কামিনী-কুলের অধরে তাঁহাদিগের পতিগণের প্রেমানুরাগ জ্ঞাপক দংশন-চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইত, রাজা ভীম সেই সুন্দরী বন্দিনীদিগের হৃদয়ও অধিকার করিতে, তিনি নিজ বাহুবলে তাঁহার শত্রুদলের ভয় বিদূরিত করেন। তিনি এতদূর উদার ছিলেন যে, শত্রুদিগকে একেবারে বিধস্থ না করিয়া, তাঁহারা ভ্রান্তিরূপে পতিত হইয়াছেন, বলিয়া ক্ষমা করিতেন। তাঁহার মূর্ত্তি যেন অনলের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল। তিনি সমুদ্রগামী নাবিকদিগকেও শিক্ষাদান করিতে ক্ষমবান ছিলেন (৯)।

সেই রাজা ভীমের ঔরষে মহারাজ ভোজ (১০) জন্মগ্রহণ করেন। যে মহারাজ ভোজ নিজ বাহুবলে রণক্ষেত্রে অসির দ্বারা বিরাটকায় করীর মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন, সেই কারণের (১১) শিরস্থ গজমুক্তা তাঁহার বক্ষস্থলে পরম রমণীয় রূপে শোভা পাইত ; রাহু যেমন চন্দ্র এবং সূর্য্যকে গ্রাস করিয়া থাকে, তিনি সেইমত নিজ অরাতি দলকে সমূলে নিধন করিতেন। যিনি সেই বিষয় চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত সুবৃহৎ জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, সেই মহারাজ ভোজের মহিমা কিরূপে বর্ণনা করিব ?

তাঁহারই ঔরষে মান নামক এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ; তিনি নানা গুণে গুণবান ছিলেন এবং সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা এক বৃদ্ধ স্থবিরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ; সেই বৃদ্ধের সেই জীর্ণশীর্ণ এবং দুর্ব্বল দেহ দর্শনে তাঁহার মনোমধ্যে ধারণা হয় যে, এই মানব দেহ কেবল ছায়া স্বরূপ-ক্ষয়শীল, দেহপিঞ্জরে যে আত্মা বাস করে, কেবল তাহারই সুবাসিত প্রসূন কদম্ব কেশরের ন্যায়। রাজপদ, ধন, ঐশ্বর্য্য সমস্তই তৃণাঙ্কুরের ন্যায় অসার এবং প্রখর প্রভাকর-করোদীপ্ত পবণ সঞ্চালিত দিবাভাগে দীপ প্রজ্বলিত করিলে, সেই দীপ যেরূপ নিষ্প্রভ এবং প্রতি মুহূর্তে নির্ব্বাপিত হইবার সম্ভাবনা, মনুষ্যের জীবনও সেইমত কখন আছে, কখন নাই। মনোমধ্যে এইরূপ অনুধাবনের পর তিনি নিজ পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণের এবং নিজ অগণিত সৎকার্য্যের কীর্ত্তি-স্বরূপ এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। এই সরোবর যেমন সুদীর্ঘ বিস্তৃত, সেইমত অসীম গভীর। যখন আমি জলধির ন্যায়, এই সুবিশাল সরোবরের প্রতি নয়নার্পণ করি, সেই সময়ে আমার মনোমধ্যে এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, এই সরোবর হইতেই মহাপ্রলয় সংসাধিত হইবে।

মহারাজ মানের অধীনস্থ সামন্ত মণ্ডলী এবং বীরবৃন্দ অতীব সমর

কুশল, অনুপমের সাহসী, পবিত্র চরিত্র এবং বিশেষ বিশ্বাসী। (১২) রাজা ধর্ম্মেরু সদৃশ, যে সামন্ত তাঁহার অনুগ্রহ নয়নে নিপতিত হয়েন, তিনি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সকল প্রকার অনুগ্রহই সম্ভোগ করিতে ক্ষমবান। যখন তাঁহার চরণ কমলে মস্তক অর্পিত হয়, তখন তাঁহার পদরেণু সেই মস্তকের অনুপম শোভা বর্দ্ধন করে।

যে সরোবরের চতুষ্পার্শে অগণিত পাদপরাজি বিরাজিত, নানা জাতীয়, বিহঙ্গমগণ যে পাদপ শাখায় বসিয়া অবিশ্রান্ত সুমধুর কুজন করে, পরম সৌভাগ্যবান শ্রীমান রাজা মান বহুব্যয়ে এবং পরিশ্রমে এই সরোবর খনন করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠাতার পবিত্র নামানুসারে এই সরোবরের নাম 'মান সরোবর' রূপে জগতে বিদিত। নাগভট্টের পুত্র অলংকার শাস্ত্রবিদ্ পুষ্যা কর্ত্তৃক এই শ্লোকাবলী বিরচিত হইল। মালবের অধীশ্বর কর্ত্তৃক (১৩) এই সরোবর নির্মিত হয়। ক্ষোত্রি খঙ্গের পৌত্র শিবাদিত্য কর্ত্তৃক এই শ্লোকাবলী খোদিত হইল।"

[নীচে ১ হইতে ১১টি টীকার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।]

'মান সরোবর' থেকে আরো কিছু পথ এগিয়ে গেলে আপনার চোখে পড়বে এক বিরাট ব্রহ্মার মন্দির।

মহারাজ কুমার পোল সোলাঙ্কী পঞ্জাবের অন্তর্গত শালপুরী জয় করে চিতোরের ব্রহ্মার মন্দিরের মধ্যে এক স্মরণলিপি খোদিত করেন। নীচে তার অনুবাদ দেওয়া হল ঃ

"যে দেব দেব মহাদেব জলধিজলে শয়ন করিয়া, পরম পরিতোষ লাভ করেন, যাঁহার জটাজুট হইতে অবিশ্রান্ত অমৃত নিঃসরণ হইতেছে, সেই মহাদেব কর্ত্তৃক আপনি রক্ষিত হউন।

যে চালুক্যজাতি অতুল ঐশ্বর্য্য বাহুবল সম্পন্ন, যে জাতিতে বহুল গুণবান বীর জন্মগ্রহণ করেন, সেই চালুক্য বংশীয় মূলরাজ এই জগতের অধীশ্বর ছিলেন।

সমুজ্জ্বল পদ্মরাগ মণির ন্যায় তাঁহার যশঃ প্রভা মেদিনীমন্ডলে বিস্তৃত ছিল এবং তিনি মানব সমাজে সুখ এবং শান্তি বর্ষণ করিতেন। এ জগতে তাঁহার তুলনা কোথায়? তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের মধ্যে অনেকেই মহাবলী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় কেহই মহাদাতা বা পবিত্রচেতা ছিলেন না।

বহুবর্ষ পরে, বহুপুরুষ গতে সেই বংশে বিশ্ববিদিত সিদ্ধরাজ জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়লব্ধ ধনরত্নে তাঁহার কলেবর বিভূষিত হইয়াছিল এবং তাঁহার যশোধ্বনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি নিজ বাহুবলে এবং সৌভাগ্যবলে অক্ষয় অসীম ধনরত্ন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহার ঔরষে কুমার পালদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং বাহুবলে নিজ সমুদয় শত্রুকে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহার আজ্ঞা জগতের অপরাপর সমগ্র নরপতি শিরোধার্য্য করিতেন। তিনি শাকম্বরীর অধীশ্বরকে নিজ চরণে প্রণত হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি শিবলোক পর্যন্ত নিজ সৈন্য পরিচালিত করিয়া, শালুপুরী নগরী মধ্যে পাব্বর্ত্য অধিরাজকে পদানত করিয়াছিলেন।

ছত্রকোট শিখরে দেবালয় সমূহের মধ্যস্থলে সর্ব্বোচ্চ চূড়োপরি তিনি এই খোদিত স্মারক লিপি সংস্থাপিত করিলেন। কারণ?—যাহাতে ইহা অজ্ঞান মূর্খদিগের হস্তগত না হয়; তজ্জনাই সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থাপিত হইল।

নিশানাথ যেরূপ মেদিনীবক্ষে সুন্দরী কামিনীদিগের অমল মুখমণ্ডল দর্শনে নিজ দেহের কলংকচিহ্ন স্মরণে লজ্জিত হয়েন, সেই মত এই শিখর শিরে এই লিপি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ছত্রকোট লজ্জিত হইতেছে।"

[সম্বৎ ১২০৭ (তারিখ এবং মাস বিলুপ্ত)]

যে-সব রাজপুতেরা দীর্ঘকাল এখানে রাজত্ব করে গেছেন তাঁদের ধর্ম, সমাজ ও ব্যবহার-নীতি সম্পর্কেও কিছু আলোচনা প্রয়োজন। কারণ চলতি ইতিহাসে আমরা সাধারণতঃ একটা জাতির কেবলমাত্র বাহ্যিক অবস্থা, বীরত্ব, নীতিজ্ঞান, শাসন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হতে পারি। কিন্তু সে জাতির আভ্যন্তরিক চরিত্র এবং বিধিব্যবস্থা কেমন ছিল, সে কথা জানতে গেলে আমাদের সেই জাতির ধর্ম, সমাজ এবং ব্যবহার-নীতির দিকে নজর দিতে হয়। সেই কারণেই কর্ণেল টড্ বলেছেন: সামাজিক আচার-ব্যবহারই যে কোন জাতির ইতিবৃত্তের সমধিক প্রয়োজনীয় অংশ। সেই জাতির আচার-ব্যবহারের ওপর দৃষ্টি দিতে পারলে তবেই সেই জাতির আভ্যন্তরিক অবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সঠিক অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব।

এখানে রাজপুত জাতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা রূপরেখা তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। এবারে তাঁদের ধর্ম, সমাজ ও ব্যবহার-নীতি সম্পর্কেও কিছু বক্তব্য পেশ করা হবে।

ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে এইসব রাজপুতেরা অতীতে জর্মান জাতির টেণ্ট (মঙ্গল) ও আর্থ (পৃথিবী) এই প্রধান দেবতাদের মধ্যে যুক্ত ছিলেন। আর্থের গর্ভে মন্বীশের ঔরষে টেণ্টের জন্ম।

স্কন্দনভের জিৎ জাতির মধ্যে শৈবীগণই সর্বাপেক্ষা অধিকতর বলবান ছিলেন। এঁরা নিজেদের আরাধ্য দেবতা আর্থের (পৃথিবী) সামনে নরবলি দিতেন। ঈশীশও এঁদের অন্যতম আরাধ্য দেবতা। শৈবীদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে: আর্থের রথ একটি গাভীর দ্বারা টানা হত।

হরিকুলেশও টেন্টের (মঙ্গল) স্তুতি গানের দ্বারা এবং তাঁদের পতাকা ও প্রতিমূর্তি হাতে শৈবীগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন এবং শেল ও মুগুড় হাতে একত্রে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতেন।

শৈবীগণই উপশলার বিখ্যাত মন্দির তৈরী করেছিলেন বলে সকলে অনুমান করেন। বসন্তকালে প্রকৃতি নব সাজে সজ্জিত হতে এইসব দেবতাগণের মহোৎসব সুরু হত। তাঁরা নিজেরা বরাহ বলি দিয়ে তার মাংস ভক্ষণ করে আনন্দ উৎসব সুরু করতেন।

রাজপুতগণ হর-রমণী বাসন্তী দেবীর পূজা করতেন। বসন্ত ঋতু আসবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুতেরা সৈন্য, সামন্ত ও পারিষদবর্গকে নিয়ে মৃগয়া করতে যেতেন এবং প্রথমেই একটি বরাহ হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করতেন।

আর্যবীর রাজপুতগণের রণধর্ম ও হর পূজা পদ্ধতির সঙ্গে শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণদের উপাসনার কোন মিল পাওয়া যায় না। রণপ্রিয় রাজপুতেরা স্বাভাবিকভাবেই শোণিত বিলাসী, তেজস্বী ও সুরাসক্ত। তাঁদের বিশ্বাস মহাদেব স্বয়ং এইসব জিনিস অত্যন্ত ভালবাসেন।

রামায়ণ ও মহাভারতে যুদ্ধ রথের প্রচলন প্রথা দেখতে পাওয়া যায়। রাজা জনক, দশরথ ও রাম থেকে আরম্ভ করে মুশলমান কর্তৃক ভারত বিজয়কাল পর্যন্ত রাজপুতগণ, যে-সব যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন সে-সব যুদ্ধের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই যুদ্ধ রথ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সারথি হয়ে প্রিয়সখা অর্জুনের যুদ্ধরথ চালনা করেছিলেন।

রাজপুতেরা তাঁদের রমণীগণের সঙ্গে যে প্রকার ব্যবহার করতেন তা অনেকটা জর্মন জাতির সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। টাসিটস্ বলেছেন: "বিষম সংকটাপন্ন দুঃসময়ে জর্মনগণ রমণীর পরামর্শ দৈববাণী বলিয়া জ্ঞান ও শ্রদ্ধা করিত।" রাজপুতেরাও যে এই প্রকার ব্যবহার করতেন তার প্রমাণ মহাকবি চাঁদদেবের কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কাব্যগ্রন্থে এ সম্পর্কে প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। রাজপুতেরা বণিতাকে 'দেবী' বলে সম্বোধন করতেন। নিজেদের পরিবারগণ অপহৃত হয়ে শত্রুর কারাগারে বন্দিনী থাকবেন এ যন্ত্রণা জর্মন ও রাজপুতদের অসহনীয় ছিল। এই যন্ত্রণা উপসম করতে প্রিয়তমাকে তাঁরা হত্যা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। এবং নিজেরাও জীবন আহুতি দিতে কুণ্ঠা করতেন না। কিন্তু কলঙ্কিত জীবন বা কুল-কলঙ্ক তাঁরা কখনই সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। যখন শত্রুর বিক্রমে স্বাধীনতা প্রায় লুপ্ত প্রায় হত, যখন দেখতেন যে মহিলাদের সতীত্ব রক্ষা করা আর সম্ভব নয়, তখন রাজপুত রমণীরা 'জহরব্রত' পালন করতেন। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের সতীত্ব রক্ষা করা রাজপুত রমণীদের কাছে এক স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

দ্যূত : দ্যূত হচ্ছে বাজি রেখে পাশা খেলা বা জুয়া খেলা। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে অতি প্রাচীন কাল থেকেই রাজপুত এবং জর্মনেরা বাজি রেখে পাশা খেলা বা জুয়ো খেলায় বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয়দের মত রাজ্য, ধন, সর্বস্ব, এমনকি স্বকীয় স্বাধীনতা পর্যন্তও পণ রেখে জর্মনেরা এই খেলায় সকৌতূহলে প্রবৃত্ত হতেন। এর কুহকে বিমোহিত হয়ে পাণ্ডবগণ পর্যন্ত সর্বস্ব হারিয়ে শেষে দ্রৌপদীকেও উৎসর্গীকৃত করতে অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁদের এই অনিষ্ঠকারী দ্যূত বিলাসিতায় ভারতের যে সর্বনাশ সংঘটিত হয়েছিল তার প্রদীপ্ত প্রমাণ ভগবান ব্যাসদেবের অমৃতময় মহাকাব্য গ্রন্থে জ্বলন্ত বর্ণে উল্লিখিত আছে। কিন্তু এত প্রমাণ সত্ত্বেও এই মহা অনর্থকারী খেলা কেউ ছেড়ে দিতে পারেননি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ধর্মের পূত-মন্ত্রেও এই ক্রীড়াকে অত্যন্ত পবিত্র বলে গ্রহণ করা হয়েছে। মনে হয় সেই কারণেই দীপান্বিতার উৎসব-উপলক্ষে রাজপুতগণ লক্ষ্মীদেবীর সন্তোষের জন্যে প্রতি বৎসর তাঁর প্রাঙ্গণে এই সর্বনাশকর খেলার আয়োজন করে থাকতেন। এ আমোদ-অনুষ্ঠানকে তাঁরা অত্যন্ত পবিত্র ধর্ম পালন হিসেবেই গ্রহণ করতেন।

সুরাপ্রিয়তা : অত্যাধিক সুরাপ্রিয়তা স্কন্দনভীয় অশি এবং জর্মনদের জিৎ-বংশ-সম্ভবের একটা প্রধানতম প্রমাণ বলে সকলে অনুমান করেন। পাশ্চাত্যের এই জীবন-দর্শনের সঙ্গে রাজপুতগণের জীবনধারার অতীব মিল দেখা যায়। তাঁরা আতিথেয়তায়, দেবোপাসনায়,সমর সজ্জায় এবং দৈনিক জীবন প্রণালীতে এই সুরাপানের আয়োজন করতেন। সুরাপান ছাড়া কোন বিশেষ অনুষ্ঠান শুভভাবে সম্পন্ন হতে পারতো না। প্রাসাদে কোন অতিথি এলেই রাজপুত রাজারা সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথমে সুরাপূর্ণ "মান্নার পেয়ালা" হাতে নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতেন। মানুষের জীবনে পানীয় বস্তু বলতে যত জিনিস আছে তার মধ্যে সুরাপানকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করতেন। যাঁরা যুদ্ধবিলাসী ছিলেন, তাঁরা কড়াসুরা পান করতে ভাল বাসতেন। এবং মহাদেবকেই তাঁরা তাঁদের উপাস্য দেবতা বলে মনে করতেন। ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে যে, শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এইসব জর্মন ও রাজপুতদের আচার পদ্ধতিতে কোন মিল নেই।

অন্ত্যেষ্টি বিধান : মৃত ব্যক্তির শেষ সংকার সাধনে রাজপুত এবং জর্মনদের যেমন সৌসাদৃশ্য দেখা যায় তাতে স্পষ্টতই প্রমাণ হয় যে, এ সকল প্রথা কোন এক আদি বংশতরু থেকে সংগৃহীত। স্কন্দনভের অন্ত্যেষ্টি বিধান অনুসারে সেই প্রদেশের এবং সেই যুগের নামকরণ হয়েছে। সে যুগে স্কন্দনভীয় বীরগণের শবদেহ পোড়ানো বা কবর দেওয়া হত। এটাই ছিল তৎকালীন প্রথা। এবং সেই প্রথা অনুসারে সেই যুগকে 'অগ্নিযুগ'

বা 'মেরুযুগ' বলে প্রসিদ্ধ ছিল। এই প্রথার প্রবর্তক ছিলেন বোধেন (বুধ)। তিনিই স্ত্রীর সহমরণ এবং শবদেহের অগ্নি সংস্কারের প্রথা প্রচলিত করেন। হেরডোটস্ বলেন : এই সকল প্রথা শাকদ্বীপ থেকে সংগৃহীত।

মৃত ব্যক্তির যদি একাধিক রমণী থাকতো তবে জিৎ ও শৈবীদের শাস্ত্রানুসারে জ্যেষ্ঠা রমণীর স্বামীর অগ্নি সৎকারে সিদ্ধা হতে পারতেন। কথিত আছে যে, বোদেনের জনৈক সহচর বণ্ডালের সঙ্গে তাঁর পত্নী নান্না সহমৃতা হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে স্কন্দনভীয়গণ এই প্রথার প্রতি ক্রমে ক্রমে বীতরাগ হয়ে পড়তে লাগলেন। স্বর্গের স্বজাতিগণের আত্মাকে এরূপ নিদারুণ যন্ত্রণায় আরোপিত করা পরবর্তী কালে তাঁদের মতে যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হয়নি। সেই কারণে তখন তাঁরা আগুনে পোড়াবার পরিবর্তে মাটিতে কবর দেওয়া আরম্ভ করেন।

হেরডোটস্ বলেছেন : শীথীয় জিৎ তাঁর প্রিয়তম অশ্বকেও নিজের সঙ্গে প্রজ্বলিত আগুনে দগ্ধ করে ফেলতেন। এবং স্কন্দনভীয় জিৎ নিজের ঘোড়া এবং যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ভূগর্ভে নিক্ষেপ করতেন। কেননা তাঁদের ধারণা ছিল যে, অশ্ব ছাড়া তাঁরা পরলোকে বোদেনের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না। এই ধরনের একটা প্রথা অতীতে রাজপুতদের মধ্যেও ছিল। তাঁরা যুদ্ধের পর তাঁদের সমস্ত সমর সজ্জা (যেমন অসিচর্ম, তরবারি, তুরঙ্গ ইত্যাদি) অগ্নিদেবতাকে উৎসর্গ করে পরে কুল পুরোহিতকে দান করতেন। রাজপুতদের সমাজ, ধর্ম, আচার ও ব্যবহার নীতি অতি কঠোর এবং পবিত্র। সেই কারণে রাজপুতদের জন্মস্থান হিন্দুদের অতি পবিত্র ভূমি। রাজপুতদের যেখানে অগ্নি সৎকার করা হয় সেই পবিত্র ক্ষেত্র সম্পর্কে রাজপুতদের মধ্যে নানাপ্রকার গল্প প্রচলিত আছে।

তাঁরা মনে করেন যে, এই পবিত্র চিতা-বেদিকার চারিদিকে বীভৎসকায়া প্রেতিনীরা ভীম মূর্তিতে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। অসাবধানতা বশতঃ যদি কেউ সেই ভূমিতে প্রবেশ করে তবে তাঁর আর রক্ষা নেই। তাঁদের ধারণা, ঐ ভাবনা প্রেতিনীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রাস করে ফেলবে। বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-বিধির সমাধান ছাড়া রাজপুতগণ আর কোন কার্যপলক্ষেই বা কোন সময়েই ঐ গভীর স্থানে যেতে সাহস করেন না। তাঁদের ধারণা বোদেন ভ্রাম্যমান উল্কানলের সাহায্যে তাদের পূর্বপুরুষ বীরদের সমাধিক্ষেত্র দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা ভীষণ শ্মশান-ভূমিতে ও সমরক্ষেত্রে এক প্রকার ভ্রাম্যমান প্রদীপ্ত উল্কানল প্রায়ই দেখতে পেতেন। এবং এই উল্কানলকে তাঁরা বোদেনের উল্কানল বলেই মনে করতেন।

স্কন্দনভীয়গণ মৃত ব্যক্তির ভস্মাবশেষের ওপর মৃৎস্তূপ নির্মাণ করতেন। হর-উপাসক হিন্দু পুরোহিত ও জিৎগণেরাও ঠিক এইরূপ

আচার পালন করতেন। রাজস্থানের স্থানে স্থানে যুদ্ধ পতিত রাজপুত-বীরের সমাধিক্ষেত্রে কখনও এইরূপ স্তূপচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। এই এই সকল সমাধি ক্ষেত্রের শিরোদেশে সেই সমস্ত রাজপুতবীরদের প্রস্তর খোদিত প্রতিমূর্তি প্রায়ই সংস্থাপিত থাকে। সে সকল প্রতিমূর্তি পূর্ণাবয়বে প্রস্তরোৎকীর্ণ।

অস্ত্রপূজা: রাজপুতেরা আর্যবংশ থেকে উদ্ভূত। শৌর্য, বীর্য, তেজস্বীতা এঁদের রক্তে রক্তে প্রবহমান। এঁরা স্বদেশের স্বাধীনতা এবং স্বজাতীর রক্ষার জন্যে আজীবন লড়াই করে এসেছেন। সেইকারণে অস্ত্র পূজা এঁদের জীবনে এক বিশেষ পূজা। যুদ্ধে যাবার আগে এঁরা অসি স্পর্শ করে শপথ করেন এবং অসি-চর্ম, শেল, খড়্গ ও শূলের সামনে প্রণতঃ হয়ে কালিকা দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

অশ্বমেধ: অশ্বমেধ রাজপুতদের একটা মহাযজ্ঞ। এই যজ্ঞের কথা রামায়ণ, মহাভারত এবং চাঁদ কবির মহাকাব্য গ্রন্থে সুন্দরভাবে লেখা আছে।

এখানে রাজপুতদের ধর্ম, সমাজ ও ব্যবহার-নীতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল। এবারে এঁদের ধর্মানুষ্ঠান, উৎসব ও সামাজিক আচার সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা হবে। কারণ একটা জাতির আভ্যন্তরিক চরিত্র ও বিধিব্যবস্থা জানতে গেলে সেই জাতির ধর্ম, সমাজ ও ব্যবহার-নীতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ধর্মানুষ্ঠান, উৎসব ও সামাজিক আচারের কথাও জানা প্রয়োজন।

॥ রাজপুত জাতির ধর্মানুষ্ঠান, উৎসব ও সামাজিক আচার ॥

রাজপুত জাতি প্রাচীন আর্যবংশ সমুদ্ভূত এবং রাণাগণ পবিত্র সূর্যবংশধর। সুতরাং সনাতন আর্যধর্ম এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাজপুত জাতি একদিকে যেমন শৌর্য, বীর্য, বিক্রম ও বাহুবলে মাতৃভূমির অনন্ত গৌরব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেইমত তাঁরা শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, দান, ব্রত, পূজা ইত্যাদিও পালন করতেন। মাতৃভূমি রক্ষা করা যেমন কর্তব্য, ঠিক তেমনি এইসব প্রথা পালনও তাঁরা একটা নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। সেই কারণে রাজপুত জাতির চরিত্র ছিল দৃঢ় এবং নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা। অসভ্য বন্য বর্বর এবং পার্বত্য জাতির বাহুবল, বিক্রম ও সাহস সবই থাকতে পারে এবং বীর সমাজে প্রশংসাও পেতে পারে কিন্তু ধর্ম বিধানে ও সামাজিক নিয়মে তারা কখনই মানব সমাজের উৎকর্ষ অবস্থার উপযোগী বলে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু রাজপুত জাতি মানব সমাজে শুধুমাত্র উৎকর্ষ অবস্থার উপযোগী বলেই গণ্য হয়নি। তাঁরা মানব সমাজে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত।

কিন্তু কর্ণেল টড্ এ-বিষয়ে একটি বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন: "রাজস্থানের অগণিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে অপরিমিত বৃত্তিদান এবং প্রভূত অর্থদান যদি অধিবাসীগণের সুনীতির নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে উৎকর্ষতার শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতে ক্ষমবান। কিন্তু প্রায়ই বিপরীত অবস্থা প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভূমিবৃত্তিদান কেবল মৃত্যুশয্যার অনুশোচনার ফল। সেই অনুশোচনা কুসংস্কার, ভয় ও পূর্ব্বজন্মের পাপচিন্তা সমুদ্ভূত এবং বৃথা গরিমা ও স্বকীয় প্রবল ক্ষমতার দ্বারা সেই দানের অঙ্গ বৃদ্ধি করিয়া দিতে ক্ষান্ত হয় না।"

কিন্তু মনুর আদেশ: "যদি নরপতি কোন অনারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি প্রজাদিগের নিকট হইতে শাসন বিধিমত যে সমস্ত অর্থ, দণ্ড স্বরূপ সংগ্রহ করেন, তৎসমস্তই যেন ধর্ম্মযাজকদিগকে প্রদান পূর্ব্বক পুত্রকে নিয়মিতরূপে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সংগ্রাম প্রাঙ্গণে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। যদি সেই সময়ে কোন সমর সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে যেন অনশনে ঈশ্বর আরাধনায় প্রাণ ত্যাগ করেন।"

রাজপুতদের মধ্যে মনুর এ আদেশের অনেক প্রমাণ আছে। রাজপুতানার মধ্যে এমন রাজ্য বিরল যেখানে ভূমির পঞ্চমাংশের একাংশ দেবতার উদ্দেশে এবং পুরোহিত, ধর্মযাজক, কবি, ভাট, চারণ ও সন্ন্যাসী ইত্যাদি পালনার্থে দান করা হয়নি।

রাজপুতরাজগণ যেমন অসির পূজা করতেন, তেমন তাঁদের হৃদয়েও ধর্মভাব জীবন্ত ছিল। বিদ্যার প্রতি ও তাঁদের ভক্তির কিছু অভাব ছিল না। কবিগণের প্রতি রাণারা যেমন অনুগ্রহ দেখাতেন, ঠিক তেমনিই ভিক্ষারী ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীরাও রাণার অনুগ্রহ লাভ করতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যুবরাজ অমর সিংহ প্রাণ ত্যাগ করলে যে ব্রাহ্মণ অমর সিংহের শেষকৃত্য সমাধা করেছিলেন, রাণী সেই ব্রাহ্মণকে ১৫ বিঘা জমিদান করেছিলেন।

কর্ণেল টড্ লিখেছেন যে, "রাজস্থানের বৈষ্ণবদিগের প্রধান উৎসব অন্নকূট। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রাজধানী থেকে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন ৭টি বিগ্রহ একত্র করে পর্ব্বত প্রমাণ অন্নব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্নাদি উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। এবং নানা প্রান্ত থেকে সমবেত হাজার হাজার বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বিকে ঐ পর্ব্বত প্রমাণ প্রসাদ বিতরণ করা হয়।"

বসন্ত পঞ্চমী: বসন্ত পঞ্চমী রাজপুত জাতির একটা প্রধান পর্ব। কথিত আছে যে, এই পঞ্চমী তিথি থেকে ঋতুরাজ বসন্ত, নিজের সৈন্য-সামন্ত সহ ত্রিভুবন শাসন করে থাকেন। এইদিন রাজপুত জাতি একেবারে উন্মাদ

মূর্তি ধারণ করেন। কাজে এবং কথায় তাঁরা অশ্লীলতা ও যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়ে থাকেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তখন সুরা ও মাদক দ্রব্য পান করেন এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণী লোকদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করে দিন কাটান। তখন শ্রেণীভেদ আর থাকে না।

ভানু সপ্তমী পর্বঃ বসন্ত সপ্তমীর দু'দিন পরে ভানু সপ্তমী পর্ব। এইদিন ধ্বান্তহারী প্রভাকরের জন্মতিথি বলে রাজপুত জাতির কাছে এটাও একটা মহামহোৎসব দিবস। মেবারের রাণারা সূর্যবংশীয়। রাজপুত জাতি সূর্যের প্রধান উপাসক। সুতরাং তাঁরা যে এই ধরনের একটা উৎসবে মত্ত হবেন এটা আশ্চর্যের কিছু নয়। এইদিন রাণারা নিজেদের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত এবং প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে মহা আড়ম্বরে চোগা নামক স্থানে গিয়ে সূর্যদেবের আরাধনা করেন।

রাজপুতদের ইতিহাসে জানা যায় যে এঁরা সূর্যের পরম ভক্ত। সূর্য এঁদের কুলদেবতা। সূর্যের জন্যে এঁরা আনন্দে এবং অতি সহজে যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিতে পারে। কারণ এঁদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করলে তাঁরা পবিত্র সূর্যলোকে প্রবেশ করতে পারবেন। আদিকালে রাজপুতগণ সূর্যের উদ্দেশে অশ্ববলি প্রদান করতেন। এবং সূর্যের নামে তাঁরা 'রবিবার' সৃষ্টি করেছিলেন। উদয়পুরে সকলের আগে সূর্যদেব পূজিত ও সম্মানিত। উদয়পুর রাজধানীর প্রবেশের প্রধান তোরণের নাম 'সূর্য পোল' এবং রাজপ্রাসাদের প্রধান সভাগৃহ 'সূর্যমহল' নামে খ্যাত।

শিবরাত্রি ঃ রাজপুতদের আরেকটি প্রধান উৎসব শিবরাত্রি। মহারাণা একলিঙ্গদেবের দেওয়ান রূপে প্রসিদ্ধ। সুতরাং তিনি ঐ দিন নিরম্বু উপবাসে ও ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করেন।

আহিরিয়া উৎসব ঃ প্রীতিপূর্ণ ফাল্গুন মাসে রাজপুত জাতির প্রধান বীর পর্বোৎসব 'আহিরিয়া' অর্থাৎ বাসন্তী মৃগয়ার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। মৃগয়ার আগের দিন রাণা সমস্ত সামন্ত এবং কর্মচারীকে হলুদ বর্ণের পোষাক পরতে নির্দেশ দেন। পরদিন সকালে সকলে সেই বেশে রাজপ্রাসাদে সমবেত হলে, এবং রাজপুরোহিত শুভ লগ্ন নির্ধারণ করে দিলে, রাণা সমস্ত সামন্ত ও কর্মচারী সহ গৌরী দেবীর শত্রু শূকর শিকারে যান। রাজপুত জাতির প্রবল বিশ্বাস যে এইদিন কোন শূকর বধ করতে না পারলে সারা বছর তাদের অমঙ্গলে ঘেরা থাকবে। সুতরাং ঐ দিন সকলে গহন বনে, পর্বত শিখরে যে কোন স্থানে, যে কোন প্রকারেই হোক শূকর শিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। রাণা তাঁর নিজের পুত্র এবং সমস্ত সামন্তগণসহ নিজেদের অশ্বারোহণে বর্শা এবং অসি নিয়ে পরস্পরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবং সর্বাগ্রে বাহুবলে, বীরত্বে এবং অসীম সাহসে বন্য শূকর শিকারে এগিয়ে যান। যে ব্যক্তি সকলের আগে শূকর বধ করতে

সক্ষম হন, তিনি সেদিনের মৃগয়ায় প্রধান বীর রূপে সম্মানিত হন। এবং এ খবর রাজধানীতে ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন।

সামন্তবর্গের সঙ্গে রাণা মৃগয়ায় গেলে কোন একটি নির্ধারিত স্থানে রাজপাচকগণ প্রচুর পরিমাণে ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে রাখে। মৃগয়ার পর রাণা সামন্তবর্গের সঙ্গে সেখানে এসে একত্রে আহার করেন।

ফলগুৎসব ঃ ফাল্গুন মাস যতই অতীত হতে থাকে রাজপুত জাতির ফলগুৎসবের সমারোহ ততই এগিয়ে আসতে থাকে। এই সময়ে তাঁদের মধ্যে আনন্দ, স্বাধীনভাবে খেলা, বিহার ও গীতবাদ্য অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। আবীর এবং কুঙ্কুমে সমস্ত রাজপথ ছেয়ে যায়। সমস্ত প্রাসাদ, রাজপথ, লোকের বেশভূষা তখন রঞ্জিত থাকে। তখন ধনবান, সম্ভ্রান্ত, সামন্ত, গৃহস্থ, দীন প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে আবীরে ও কুঙ্কুমে নিজেদের রাঙিয়ে রাখে। সকলের মুখেই তখন হোলীর গান, হোলীর কবিতা।

ফলগুৎসবের শেষ দিনে রাণা সমস্ত সামন্তকে পরিতোষ রূপে ভোজন করিয়ে সকলের সম্মানার্থে প্রতিজনকে কাঠের তৈরী তরবারি এবং নারকেল দান করেন। এইভাবে মুখর উৎসব শেষ হয় এবং পরের দিন সমস্ত লোকেরা আবার নিজেদের কাজে যথাযথ যোগদান করেন।

ফাল্গুন মাসের পর আসে চৈত্র মাস। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় রাজপুতদের নৈতিক এবং রাজনৈতিক শিক্ষা গ্রহণের মাস। মেবারের যে সকল পূর্ব সামন্তেরা রাণাদের প্রতি রাজভক্তি এবং বিশেষ বীরত্বে আত্মপ্রাণ দান করে রাণাদের হিতসাধন করেছিলেন, তাঁদের বংশধরগণ এইদিন রাণাদের কাছ থেকে মহাসম্মান লাভ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, রাণা প্রতাপ সিংহ হলদিঘাটের চিরস্মরণীয় সমরে ঝালা সামন্ত মান্নার কাছে যে প্রভূত উপকার পেয়েছিলেন, উত্তরকালে তাঁর উত্তরাধিবর্গ শেষ দিন পর্যন্ত রাণার সভায় সবিশেষ রূপেই সম্মানিত ছিলেন। উদয়পুর নগরে ত্রিপোলিয়া নামক প্রধান তোরণে কোন সামন্তই জয়ঢক্কা বাজনার সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন না। কিন্তু হলদিঘাটের যুদ্ধে সেই ঝালা সর্দারের রাজভক্তি এবং বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে এই সম্মান-সূচক ক্ষমতা দান করা হয়েছিল। এবং এই ক্ষমতা সেই ঝালা-বংশের উত্তরাধিকারীরাও শেষ দিন পর্যন্ত ভোগ করেছিলেন।

শীতলা পূজা ঃ এরপর চৈত্র মাসের অষ্টমীতিথিতে শীতলা দেবীর পর্বোৎসব এগিয়ে আসে। এই সময় সমস্ত রাজ-রমণীরা নিজেদের পুত্র কামনায় মন্দিরে যান ও পুজো দিয়ে থাকেন।

জন্মোৎসব পালন ঃ রাণাদের জন্মতিথি উৎসব পালনও একটা মহোৎসব বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই দিন রাজধানীর সকল শ্রেণীর

প্রজারাই মহাআনন্দে নতুন নতুন বেশভূষা পরে নিজের নিজের পদ অনুযায়ী উপহার দ্রব্য নিয়ে রাজপ্রাসাদে যান এবং রাণাকে অভিনন্দন জানিয়ে থাকেন।

অন্নপূর্ণা পূজা: রাজপুতেরা যত মহোৎসব পালন করে থাকেন তার মধ্যে অন্নপূর্ণা পূজা শ্রেষ্ঠ। একটা নির্ধারিত শুভদিনে নগরের বাইরে অন্নপূর্ণা এবং মহেশ্বরের প্রতিমা নির্মাণের জন্যে বিশেষ প্রতিনিধি পাঠানো হয়। অন্নপূর্ণা ও মহেশ্বরের মূর্তি তৈরী হয়ে গেলে, কুল-কামিনীগণ সেই মূর্তিকে প্রদক্ষিণ করে নাচ-গান ও উৎসব পালন করেন এবং শেষে নিজেদের স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করেন। পুজো শেষ হলে সেই মূর্তি দুটিকে সাগর-কূলে আনা হয়। এখানে পুরুষেরা নিরব দর্শকমাত্র। প্রতিমার সঙ্গে কেবলমাত্র রূপবতী যুবতী কন্যারাই নাচ-গান ও বাদ্যের সঙ্গে অনুগমন করেন। প্রতিমা যখন সাগরকূলে আনা হয়, তখন ঘনঘন কামান ধ্বনি করে প্রত্যেককে জানানো হয়। তখন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নতুন পোষাকে সেই সাগরকূলে সমাবেত হন। লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে সেই মূর্তি দুটিকে স্নান করিয়ে আবার প্রাসাদে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ক্রমাগত তিন দিন ধরে পূজা ও উৎসব পালন করা হয়।

ভানুসপ্তমী: বাসন্তী পঞ্চমীর দু'দিন পরেই ভানু সপ্তমী উৎসব কথিত আছে সূর্যদেব এই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সূর্যবংশীয় রাণাগণ যে নিজেদের বংশের আদি পুরুষের জন্মদিবস নানাপ্রকার আনন্দোৎসবে পালন করবেন এ ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিকগণই একমত এই সময়ে রাণা তাঁর সৈন্য, সামন্ত, সর্দার ও পারিষদ বর্গে পরিবৃত হয়ে চৌগাঁ নামে এক পবিত্র জায়গায় গিয়ে থাকেন এবং সেখানে ভগবান দিবাকরের পূজা শেষ হয়।

শিবরাত্রি: মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুন মাসের আরম্ভে কৃষ্ণ চতুর্দশী পক্ষ শিবরাত্রি নামে অভিহিত। হিন্দু মাত্রেই বিশেষতঃ রাণা এই শিবরাত্রিকে পবিত্র জ্ঞান করে থাকেন। রাণা "শিবের প্রতিনিধি" নামে খ্যাত। রাজপুতগণ সেই দিন নিরম্বু উপবাসে অতিবাহিত করেন।

ফুলদোল: হিন্দুরাজ চক্রবর্তী বিক্রমাদিত্যের চান্দ্রসৌর বর্ষারম্ভের সঙ্গে রাজপুতদের কুসুমোৎসব আরম্ভ হয়। রাজপুতগণ এই উৎসবকে ফুলদোল নামে অভিহিত করে থাকেন। আশ্বিনের ন-রাত্রি পর্বে যে সমস্ত আনুষ্ঠানিক বিধি পালন করা হয়ে থাকে, ফুলদোলে তার অধিকাংশই দেখতে পাওয়া যায়। ঐ উৎসবের প্রথম অনুষ্ঠান খড়্গপুজা। রাণার প্রাসাদে এই পুজাবিধি পালিত হয়। কিন্তু বাসন্তী পূজায় যে সকল উৎসব পালন করা হয়ে থাকে খড়্গপুজা তার কাছে অতি সামান্য। মধুময় বসন্তের আবির্ভাবে সমস্ত জগৎ মাধুরীমায় ভরে ওঠে। এই মধুমাসে রাজপুতগণের ঘরে ঘরে

আনন্দের বান ডাকে। রাজপুত কামিনীগণ পুরুষগণও প্রমোদ কুঞ্জবনে নাচ, গান ও উৎসব করে থাকেন। তাঁদের মাথায় থাকে কুসুম-মুকুট, গলায় কুসুমহার এবং সর্বাঙ্গ ফুলে ঢাকা। কুঞ্জবনে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও পদাবলী গান হয়ে থাকে।

অশোকাষ্টমী ঃ সকল রাজপুতগণই এই অশোকাষ্টমীতে বিশ্বমাতাকে পুজো করে থাকেন। রাণা এই দিনে নিজেদের সর্দার, সামন্ত ও পারিষদবর্গের সঙ্গে চৌগাঁ প্রাসাদে গিয়ে সমস্তদিন নানা আমোদ-প্রমোদে অতিবাহিত করেন। এই দিন প্রত্যেক রাজপুতই নিজেদের কুলদেবতা ভগবতীকে পুজো দিয়ে থাকেন।

রামনবমী ঃ অশোকাষ্টমীর পরের দিনই রামনবমী। রাজপুতদের ধারণা এই শুভদিনে রবিকুলতিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করে-ছিলেন। সুতরাং তাঁর বংশধরগণ যে এই দিনটিকে অতি পবিত্র জ্ঞান করবেন এটাই স্বাভাবিক। এই রাম নবমীতে যুদ্ধের সমস্ত অস্ত্র, হাতি ও ঘোড়া পুজো করা হয়ে থাকে। রাণা ঐদিন চৌগাঁ প্রাসাদে সমস্ত সামন্ত ও সর্দারদের নিয়ে মহাসমারোহে যাত্রা করেন। সেখানে নানাপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রে বলা আছে যে, এই দিনে ভগবান রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করে যে যা কিছু করবে, তাতেই অনেক পুণ্য লাভ হবে। বিশেষতঃ যিনি উপবাস এবং সারা রাত জেগে পিতৃলোকের তর্পণ করতে পারবেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হবেন।*

*[তস্মিন্ দিনে মহাপুন্যে রাম মুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ।
যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদ্ভবক্ষয় কারকম্ ॥
উপোষণং জাগরণং পিতৃনুদ্দিশ্য তর্পণম্।
তস্মিন্ দিনেতু কর্ত্তব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তি মভীপসুভিঃ ॥]

॥ অগস্ত্য সংহিতা ॥

মদন ত্রয়োদশী ঃ চৈত্র শুক্লত্রয়োদশীতে রাজপুতগণ মীনকেতন কন্দর্পের পুজো করে থাকেন। যদিও ওর পূর্ব ও পরবর্তী দ্বাদশী ও চতুর্দশীতেও পুজোর ব্যবস্থা আছে। তবুও রাজপুতগণের মতে এই দিনই বিশেষ প্রশস্ত। এই সময়ে মধুমাস সাধারণতই গত। নিদাঘের গরম বাতাস ধীরে ধীরে বইতে সুরু করে। ফুলে ভরা গাছ-গাছালীর সমস্ত ফুলদল খসে যেতে সুরু করে। কিন্তু ফুলেশ্বরী চামেলী তখনো প্রকৃতির আঙ্গিনায়। রাজপুত রমণীগণ এই কুসুম-রঙ্গের মালা তৈরী করে নিজেদের কাল চুলে জড়িয়ে মদন-দেবের পুজো করে থাকেন।

কর্ণেল টড্ বলেছেন, "রাজপুত রমণীগণ যে-রূপ ভক্তি সহকারে মীনধ্বজের পুজো করিয়া থাকেন, ভারতবর্ষের আর কোথাও এমন পুজো হয় না। তাঁহারা কামদেবকে এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন ঃ"

["পুষ্প ধন্বন্ ! নমস্তেঽস্তু নমস্তে মীনকেতন !
মুণীনাং লোকপালানাং ধৈর্য্যচ্যুতি কৃতে নমঃ।
মাধবাত্মজ ! কন্দর্প ! সম্বরারে ! রতিপ্রিয় !
নমস্তভ্যং জিতাশেষ—ভুবণায় মনোভুবে ॥
আধয়ো মম নশ্যন্তু ব্যাধয়শ্চ শরীরজাঃ।
সম্পদ্যতাম ভীষ্টং মে সম্পদং সন্তু মে স্থিরাঃ ॥
নমো মারায় কামায় দেবস্য মূর্ত্তয়ে।
ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবেন্দ্রানাং মনঃক্ষোভ করায় চ ॥"]

রাজপুতদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যিনি অনঙ্গদেবের উক্তরূপে স্তবস্তুতি করে পূজা করেন, সারা বৎসরের মধ্যে তাঁর কোনরূপ আধি-ব্যাধি বা বিপদ হয় না।

নব গৌরীপূজা : মদনোৎসবের সঙ্গে সঙ্গে চৈত্র মাস শেষ এবং সেই সঙ্গে একটা অতীত বছরও শেষ হয়। বৈশাখের কঠোর সূর্যের তেজ কপালে নিয়ে নববর্ষ সুরু। হিন্দু শাস্ত্র মতে বৈশাখ পরম পবিত্র মাস। এ মাস বছরের সকল মাসের শ্রেষ্ঠ। এবং ভগবান মাধবের অতি প্রিয়। এই মাসে যিনি নিয়মিতভাবে পূজো করতে পারেন, তিনি মৃত্যুর পর বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হয়ে বিষ্ণুর সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারেন। কিন্তু রাজপুতগণের মধ্যে এই পুন্যময় মাসে কেবলমাত্র একটি উৎসবই হয়ে থাকে। তাও অতি সামান্য। সে পূজার নাম নব গৌরী পূজা। এই পূজার সময় সমস্ত সর্দারেরা একত্রে রাণার প্রাসাদে যাত্রা করেন। এই যাত্রার নাম "নাকরা কা আসোয়ার"। সেখানে ভগবতী গৌরীকে স্নান করিয়ে নানাপ্রকার পূজা করা হয়ে থাকে। এই পর্বটি সম্পূর্ণ নতুন। এ পর্ব রাণা ভীমসিংহ কর্তৃক ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সূচীত। কিন্তু উত্তরকালে রাণাগণ এই অভিনব উৎসবকে হিন্দু-ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত বলে জ্ঞান করেন। কারণ যে বছর এই উৎসব প্রথম পালিত হয়, সেই বছর পেশোলার জলস্রোত সহসা প্রচণ্ড বেগে উচ্ছ্বাসিত হয়ে সমস্ত রাজ্য প্লাবিত করে। সেই আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে রাণাদের প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়। সেই জলোচ্ছ্বাসে নগরের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী ও ধনরত্ন বিধ্বস্ত হয়। কথিত আছে সেই বিপ্লব-দিবসে রাণার একটি পুত্র অকস্মাৎ প্রাণত্যাগও করে। কিন্তু পরবর্তী রাণারা এ অতীত ঘটনা ভ্রূক্ষেপ করেননি। তাঁরা নিজেদের প্রাসাদে আমোদ-প্রমোদ ও পূজা পালন করে থাকেন। এই অভিনব উৎসব উপলক্ষ্যে ভগবতী গৌরীর পূজাবিধি অতীব আনন্দ উৎসবের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়।

সাবিত্রী ব্রত : জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাচতুর্দশীতে সাবিত্রী ব্রত আচরিত হয়। যে সমস্ত মহিলা এই পর্ব উপলক্ষ্যে উপবাস করেন, সতী-প্রধানা সাবিত্রীর পুণ্যকথা শ্রবণ ও তাঁর পূজা করেন, তাঁরা কখনও বৈধব্য যন্ত্রণায় নিপীড়িত

হন না। সেই কারণে রাজপুত রমণীগণ ঐ দিনে নির্দিষ্ট বটগাছের নীচে যথা বিধানে সাবিত্রীর অর্চনা ও তাঁর পুণ্যকথা শ্রবণ করে থাকেন।

রম্ভা তৃতীয়া ঃ হিন্দু রমণীগণ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাতৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত পালন করে থাকেন। রম্ভা ভগবতী গৌরীর অপরা মূর্তি। তিনি যে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ মূর্তিতে হিন্দুগণ-কর্তৃক পূজিত হয়ে থাকেন, এ মূর্তি তার অন্যতম। রাজপুত রমণীগণ ধনভাগ্য-লাভের আশায় এ দেবীর আরাধনা করে থাকেন।

অরণ্য-ষষ্ঠী ঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে দেবসেনা ভগবতী ষষ্ঠী দেবীর যে পূজা হয়ে থাকে তার অপর নাম অরণ্য ষষ্ঠী। দ্বাদশ মাসে ভগবতী যে দ্বাদশ (*১) মূর্তিতে প্রসূতিগণ-কর্তৃক পূজিত হন এ পূজা তার অন্যতম। এই উৎসব উপলক্ষ্যে পুত্রার্থিনী ও পুত্রমঙ্গলার্থিনী হিন্দু রমণীরা অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করে বট বা অশ্বত্থ মূলে দেবীর পূজা করে থাকেন। বাংলা-দেশের মত রাজপুতদের মধ্যেও এ পূজায় কোন বিশেষ আড়ম্বর দেখতে পাওয়া যায় না।

(*১) "প্রসূত্যো দ্বাদশে মাসি সম্পূজ্য পত্যাবৃদ্ধয়ে।
সূতে জাতে তথা ষষ্ঠ্যাং ষষ্ঠী দ্বাদশ রূপিণী॥
বৈশাখে চান্দনী ষষ্ঠী জ্যৈষ্ঠে চারণ্য সংজ্ঞিতা।
আষাঢ়ে কান্দর্মী জ্ঞেয়া শ্রাবণে লুণ্ঠনী তথা।
ভাদ্রে চপেটী বিখ্যাতা দুর্গাখ্যা শ্বযুজে তথা।
নাত্যাখ্যা কার্ত্তিকে মাসি মার্গে মূলক রূপিণী॥
পৌষে মাস্যন্নরূপা চ শীতলা তপসি স্মৃতা।
গোরাপিনী ফাল্গুনে চ চৈত্রেঽশোকা প্রকীর্তিতা।"
॥ স্কন্দপুরাণ ॥

রথযাত্রা ঃ আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবান বিষ্ণুর রথযাত্রা। হিন্দুশাস্ত্রে নারায়ণের দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটি যাত্রাকথা বলা আছে। সেই দ্বাদশ যাত্রা দ্বাদশটি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ (*২)। রথযাত্রা তার অন্যতমা। যদিও রাজপুতগণ ভগবানের দোলযাত্রা ও ঝুলন-যাত্রা বিশেষ আড়ম্বর ও সমারোহের সঙ্গে সমাপন করে থাকেন কিন্তু তবুও এই উৎসবে তাঁদের সামান্যই উদ্যোগ দেখতে পাওয়া যায়।

(*২) "বৈশাখে চান্দন, জ্যৈষ্ঠে স্নান, আষাঢ়ে রথারোহণ, শ্রাবণে শয়ন, ভাদ্রে পার্শ্বপরিবর্ত্তন, আশ্বিনে বাম পার্শ্ব পরিবর্তন, কার্ত্তিকে উত্থান, অগ্রহায়ণে প্রাবরণ, পৌষে পুষ্যস্নান, মাঘে শাল্যোদন, ফাল্গুনে দোলারোহণ এবং চৈত্রে মদনভঞ্জিকাযাত্রা।"

[স্কন্দপুরাণে ভগবান বিষ্ণুর এই দ্বাদশ যাত্রার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।]

পার্বতী তৃতীয়াঃ শ্রাবণ মাসের শুক্লতৃতীয়াতে রাজপুতগণ পার্বতী ব্রত পালন করেন। কথিত আছে এই দিনে গিরিবালা ভগবতী গৌরী ভগবান মহাদেবের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। রাজপুতগণ এই পর্বকে অতি পবিত্র এবং অবশ্য পালনীয় বলে জ্ঞান করেন। তাঁদের বিশ্বাস যে, যদি এই দিনে কোন রমণী ভক্তি সহকারে পার্বতীকে পূজা করেন, ভগবতী তাঁর সর্বকাম পূরণ করে তাঁকে অন্তিমে নিজের সহচরী করে নেন। সেই কারণে রাজপুত রমণীগণ অত্যন্ত ভক্তি সহকারে এই দেবীর পূজা করে থাকেন। রাজ[illegible] যদিও এই ব্রত পালন করেন না, কিন্তু তাঁদের মতে এই পর্ব অতি পবিত্র ও পুণ্যময়। ভূমি-অধিকার অথবা পরিত্যক্ত গৃহে পুনরাগমন বিষয়ে তাঁদের মতে এসময় অতি শুভ ও পবিত্র লগ্ন।

এইদিনে প্রত্যেক রাজপুতই লোহিত বর্ণের বেশ ধারণ করে থাকেন। জয়পুরের নৃপতিরা এই উপলক্ষে নিজেদের সর্দারদের লোহিত বর্ণের এক একটি পোষাক বিতরণ করেন। উদয়পুর অপেক্ষা জয়পুরে এই ব্রত পালনের কিছু বিশেষ আড়ম্বর দেখতে পাওয়া যায়। জয়পুর বাসিনী রমণীগণ ভগবতী-পার্বতীর একটি প্রতিমা প্রস্তুত করে ও উত্তমরূপে সাজিয়ে সুন্দর সংগীত সহকারে নিজেদের কাঁধে বহন করে থাকেন। রাণা স্বয়ং এবং সর্দারগণ এই রমণীদের পেছনে পেছনে গমন করেন। এই উৎসব উপলক্ষ্যে সকল রাজপুতই নিজেদের দুহিতাকে এক একটি লাল পোষাক দিয়ে থাকেন।

নাগ পঞ্চমীঃ শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে নাগজননী ভগবতী মনসার পূজা হয়ে থাকে। বর্ষার অবিরাম ধারা-পতনে মাঠ-ঘাট পরিপূর্ণ হলে সাপেরা গ্রামের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিতে থাকে। সুতরাং এই সময়ে নাগগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভগবতী মনসা নাগেশ্বরী এবং বিষহরী। রাজপুতদের ধারণা ঐ পঞ্চমী তিথিতে নাগের পূজা করতে পারলে লোকের নাগভয় দূর হয়। সেইজন্য সকল হিন্দুই যথা বিধানে জগৎ গৌরী মনসার পূজা করে থাকেন। তবে উদয়পুরে মনসা-পূজার বিশেষ আড়ম্বর দেখতে পাওয়া যায় না।

রাখী পূর্ণিমাঃ শ্রাবণী পূর্ণিমাতে রাজপুতগণ এই উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। কথিত আছে মুনি পুঙ্গব দুর্বাসার উপদেশানুসারে সকল প্রকার বিঘ্ন ও বিপদ থেকে দূরে থাকবার জন্যে নিজে একগাছা বলয় ধারণ করেছিলেন। সেই বলয় রাজপুতগণ কর্তৃক রাখী-বলয় নামে অভিহিত হয়ে থাকে। রাজপুতদের মতে কেবল ধর্মযাজক ও রমণীগণই এই বলয় বিতরণ করতে পারেন। অন্যথা সেটা অপ্রসিদ্ধ বলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে। রাজপুত মহিলাগণ যে ব্যক্তিকে ভ্রাতৃত্বে বরণ করতে বাসনা করেন, নিজেদের

সখী অথবা কুলপুরোহিতদের মাধ্যমে তাঁর কাছে ঐ রাখীবলয় পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন। যাঁরা এইরূপ সম্মান পান তাঁরা যথাবিধানে এর প্রতিদান করতে ত্রুটি করেন না। আমাদের বাংলাদেশেও ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় ভগিনীগণ যেমন ভ্রাতাদের নব-বাস প্রদান করে থাকেন, রাজপুত রমণীরাও ঐ পূর্ণিমা তিথিতে নিজের ভাইকে নতুন পোষাক দান করেন।

জন্মাষ্টমী: ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন। সকল হিন্দুই এই দিনটিকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে থাকেন। রাণা উক্ত কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে সর্দার ও পারিষদগণের সঙ্গে চৌগাঁ প্রাসাদে আসেন। সেই তৃতীয়া থেকে অষ্টমী পর্যন্ত ক্রমাগত ছ'দিন তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ বিধানে পূজা করে থাকেন। সেই সময়ে সকলেরই গায়ের পোষাক হলুদ থাকে। সকলের মুখেই হরিনাম-কীর্তন শোনা যায়।

এই সময়ে রাণারা নিজেদের পিতৃদেবতাগণের তর্পণ করে থাকেন। এই তর্পণ ক্রমাগত এক পক্ষকাল ধরে চলে। রাণারা পিতৃপুরুষের সমাধি মন্দিরে গিয়ে ধূপ, দীপ, ফুলের মালা ও নানাপ্রকার নৈবেদ্য দিয়ে তাঁদের পূজা করে থাকেন। এবং ফুলের মালা দিয়ে মন্দির সাজিয়ে রাখেন।

খড়্গপূজা: যে উৎসব উপলক্ষে রাজপুতগণ খড়গ পূজা করে থাকেন তার নাম 'নরাত্রি'। এই 'নরাত্রি' মহোৎসব রাজপুতদের সমর দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আশ্বিন মাসের প্রথম দিন থেকে এই বিচিত্র পূজা আরম্ভ হয়। সেইদিন রাণার উপবাস। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করে স্নান শেষে খড়গপূজায় বসেন। গিহেলাট্‌কুলের প্রসিদ্ধ দ্বি-ধার অসি এই সময়ে আয়ুধাগার থেকে বাইরে এনে যথা বিধানে পূজা করা হয়। তদনন্তর রাণা নিজের সর্দারগণের সঙ্গে একত্রিত হয়ে পবিত্র খড়গকে 'কিষণ পোল' নামে একটা প্রসিদ্ধ তোরণদ্বারে নিয়ে আসেন। সেই তোরণদ্বারের পাশেই ভগবতী অষ্টভুজার মন্দির আছে। সেই মন্দিরের দ্বার দেশে রাজযোগী (*) নিজেদের অনুগত মহন্ত ও অন্যান্য যোগীগণের সঙ্গে রাণার হাত থেকে সেই খড়গ নিয়ে দেবীর সামনে রেখে অতি সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দেন। সেই দিন বেলা তিনটার সময় নগরের ত্রি-দ্বার মঞ্চ থেকে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শোনা যায়। এটা একটা সংকেত ধ্বনি। এই সংকেত ধ্বনি শোনামাত্র রাণা নিজের সর্দার ও সামন্তদের নিয়ে মহিষশালায় গিয়ে একটি মহিষ এনে বলি দেন। তারপর তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে সেই রাজযোগীদের (*) পাশে বসে পূজা করেন। দুটি রৌপ্যমুদ্রা ও একটি নারকেল তাঁদের দান করেন এবং খড়্গের পূজা শেষে নিজের প্রাসাদে ফিরে আসেন।

দ্বিতীয় দিবস: আগের দিনের মত রাণা এই দিনও সদলে চৌগাঁ

প্রাসাদে গিয়ে একটি মহিষ উৎসর্গ করেন। সন্ধ্যায় রাণা জগন্মাতার মন্দিরে গিয়ে কিছু ছাগ ও মহিষ উৎসর্গ করে আসেন।

তৃতীয় দিবস ঃ এই দিনেও রাণার চৌগাঁ প্রাসাদে যাত্রা এবং সেখানে মহিষ বলিদান। সন্ধ্যাকালে পবিত্র মন্দিরে আরো পাঁচটি মহিষ বলিদান।

চতুর্থ দিবস ঃ রাণার চৌগাঁ প্রাসাদে গমন। মহিষ বলিদান। সন্ধ্যায় মন্দিরে পূজা শেষে রাজযোগীকে (*) শর্কর ও ফুলের মালা উপহার ও মহিষ বলিদান। এই বলিদানের ব্যাপারে রাণাদের বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরের অল্পদূরে মহিষ যূপবন্ধ থাকে। রাণা একটি সিংহাসনে বসে ধনুর্বান হাতে নিয়ে অব্যর্থ সন্ধানে সেই পশুকে বধ করেন।

(*) [রাজযোগী ঃ রাজস্থানে একদল যোগী আছেন। তাঁরা আবশ্যক মত অসি ধারণ করে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। সেই যোগী-সম্প্রদায়ের অধিপতির নাম রাজযোগী।]

পঞ্চম দিবস ঃ চৌগাঁ প্রাসাদে নিয়মিত বলিদানের পর রাণার আদেশে সেখানে গজযুদ্ধ হয়ে থাকে। পরে তিনি সদলে ভগবতী আশাপূর্ণার মন্দিরে যাত্রা করেন। তথায় একটি মহিষ ও একটি মেষ বলি দিয়ে তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রসাদ লাভ করেন।

ষষ্ঠদিবস ঃ এই দিনেও রাণা নিয়মিত চৌগাঁ প্রাসাদে আসেন। কিন্তু কোনপ্রকার বলি হয় না। অপরাহ্নে চতুর্ভুজ দেবীর পূজা-আরতি শেষ করে তিনি কান-ফোড়া যোগীদের মহন্ত ভিখারীনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

সপ্তম দিবস ঃ চৌগাঁ প্রাসাদে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান শেষে রাণা প্রধান অশ্বপালকে আদেশ করলে সে ব্যক্তি রাণার সমস্ত অশ্বগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সরোবরে স্নান করিয়ে আনেন। সেই দিন রজনীযোগে প্রাসাদে হোমের ধূম পড়ে যায়। একটি মেষ ও একটি মহিষ সেদিন বলি দেওয়া হয়। সেদিন রাণা কান-ফোড়া যোগীদের নিমন্ত্রণ করে নানাপ্রকার মিষ্টান্নে সেবা করেন।

অষ্টম দিবস ঃ অষ্টম দিবসে প্রাসাদে হোম হয়। ঐদিন বিকেলে রাণা নির্বাচিত সর্দারের সঙ্গে নগরের বাইরে কিছু গোস্বামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

নবম দিবস ঃ এই দিন রাণারা আর চৌগাঁ প্রাসাদে যান না। রাণার অনুমতি ক্রমে অশ্বপালগণ অশ্বদের স্নান শেষে প্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং পূজা হয়। রাণারা এইসব অশ্বপালকে পুরস্কার দান করেন। রাজযোগীরা প্রাসাদে সেই খড়গ নিয়ে এলে রাণা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে সেই অসি গ্রহণ

করেন এবং যোগীদের উপহার দান করেন। যে মহন্তেরা ক্রমাগত নয় দিন ধরে উপোস কোরে খড়্গের পুজো করেন, রাণা তাঁদের অনেক রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা দান করেন এবং ভালভাবে আহারের ব্যবস্থা করেন।

দশম দিবস ঃ এই দশমী তিথি ভারতের সমগ্র হিন্দু সমাজে বিশেষ পরিচিত। কথিত আছে ভগবান রামচন্দ্র সীতাদেবীকে উদ্ধারের জন্যে এই পবিত্র দিনে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। রাজপুতগণ এই দিনটিকে সামরিক ব্যাপারে বিশেষ উপযোগী বলে মনে করেন। এইদিন সকালে রাণা নিজের দীক্ষাগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদিকে চৌগাঁ অথবা মাতাচল গিরিকুটে নানাপ্রকার আসন পাতা হয়ে থাকে। সেখানে গোলন্দাজ সেনারা সুন্দর পোষাকে অপেক্ষা করে। সন্ধাকালে রাণা ও সর্দারেরা ঐ মন্দিরে এসে কৈজরী নামে একটি গাছকে পুজা করেন এবং পরে একটি পিঞ্জরাবদ্ধ নীলকণ্ঠ পাখীকে উদ্ধার করে গগনভেদী কামানের গর্জনের মধ্যে নিজের প্রাসাদে ফিরে যান।

এইভাবে একাদশ দিবস নানা অনুষ্ঠান এবং পুজা-মাধ্যমে পালিত হয়ে থাকে। এই খড়্গের সম্বন্ধে রাজপুতদের মধ্যে নানাপ্রকার গূঢ় ও অদ্ভুত বিবরণ শুনতে পাওয়া যায়। তাঁদের বিশ্বাস যে, ভগবতী চতুর্ভুজা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে খড়্গ তৈরী করে বাপ্পারাওলকে প্রদান করেছিলেন। সেইদিন থেকে গিহেলাট্ রাজকুমারগণ দীর্ঘকাল সেই দেব-কৃপাণ অস্থাবর সম্পত্তির মত ভোগ করে আসছিলেন। পরিশেষে যেদিন দুর্ধর্ষ তাতার বীর আলাউদ্দীন চিতোর গড় আক্রমণ করলো, যেদিন চিতোরের দ্বাদশবীর মাতৃভূমিকে উদ্ধার করবার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, যেদিন সতী-প্রধানা পদ্মিনী চিতোরের লক্ষ্মী স্বরূপিণী অগণ্য রমণীর সঙ্গে জলন্ত চিতায় প্রাণত্যাগ করলেন, সেইদিন সেই পবিত্র খড়্গ গিহেলাট্ কুলের অধিকার থেকে কিছুদিনের জন্যে বিচ্যুত হল। আলাউদ্দীন চিতোর জয় করেই মালদেব নামে একজন শনিগুরু সর্দারের হাতে শাসন ভার অর্পণ করেন। ধীরবর হামীর সেই মালদেবের বিধবা দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। মালদেব চিতোর গড় হাতে পেয়েই চিতোরের ধন-রত্ন ভাণ্ডার লুটের মনস্থ করেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, ভূগর্ভে যেখানে চিতোরের সতীগণ 'জহর ব্রত' পালন করেছেন সেখানে প্রচুর অমূল্য রত্ন-রাশি লুকানো আছে। এই বিশ্বাসে তিনি সেই ভীষণ গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করতে কৃত সংকল্প করলেন। যদিও তাঁর মনের মধ্যে এই বিকট গহ্বর সম্পর্কে দারুণ একটা ভীতিও ছিল। কিন্তু দারুণ লোভ ও কৌতূহল তাঁকে সেদিকে টানতে লাগলো। ঐ সুড়ঙ্গ সম্পর্কে নানা লোকের মুখে নানা বিভীষিকাময় গল্প ছড়ানো আছে। কেহ বলে ঃ অনেক প্রেতিনী রাতে নৃত্য করে বেড়ায়। কেহ বলে ঃ ওই সুড়ঙ্গে ঢুকলে আর ফিরে

আসা যায় না। মালদেব নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনেও ভীত হলেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা অচল। অবশেষে তিনি সেই দারুণ কৌতূহলে এবং সাহসে একদিন গভীর রাতে ঐ ঘোরতমসাচ্ছন্ন গহ্বরে প্রবেশ করলেন। তিনি কি ভাবে এবং কোন পথে ঐ গহ্বরে প্রবেশ করেছিলেন, ভট্ট গ্রন্থে তার কোন উল্লেখ নেই।

সেই সুড়ঙ্গ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই গভীর সূচীভেদ্য বিভীষিকাময় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে মালদেবের শ্বাসবায়ু রোধ হবার উপক্রম হতে লাগলো। প্রতি মুহূর্তে তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কা হতে লাগলো। তিনি এতে আকুল বা ভীত হলেন না। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। শেষে ঐ সুড়ঙ্গ মধ্যে একধারে একপ্রকার নিবিড় নীল-লোহিত আলো দেখতে পেলেন। তিনি ঐ আলো দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি দেখলেন যে, এক বিরাট চুল্লীর ভেতর থেকে একপ্রকার নীল রক্ত-অনল জ্বলছে। সেই আলোকে সুড়ঙ্গ আলোকিত। কতকগুলো বীভৎস নাগিনী সেই আলো বেষ্টন করে নৃত্য করছে। মালদেব অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর ঐ নাগিনীরা মালদেবকে এখানে আসবার কারণ জানতে চাইলেন। মালদেব তাঁদের প্রণাম করে বললেনঃ যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর অথবা নাগ, আপনারা যাই হোন-না-কেন আপনাদের প্রণাম। আপনাদের শান্তি-ভঙ্গের জন্যে আমি দুঃখিত। গেহলাট্ কুলের অধীশ্বর বীরবর বাপ্পারাওলকে ভগবতী চতুর্ভুজা একখানা খড়গ দান করেছিলেন। সেই খড়গ এতদিন চিতোরেই ছিল। কিন্তু যবন-বিপ্লবে সেই খড়গ কোথায় গেল আমার জানা নেই। অতএব আপনাদের চরণে নিবেদন আপনারা যদি সেই খড়গ রেখে থাকেন তবে প্রত্যার্পণ করুন। নাগিনীরা সেই কথা শুনে অনেক পরীক্ষার পর মালদেবকে সে খড়গ প্রত্যার্পণ করে। মালদেব অনেক কষ্টে ঐ সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন।

> [মালদেবের উক্ত দৈব কৃপাণোদ্ধারের সঙ্গে জিৎ-রমণী হার্বারের ত্রিশুঙ্গ নামক অসির উদ্ধারের সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কি রাজপুত, কি জিৎ সকল প্রাচীন বীরগণ যে অসিকে প্রধানতম সহায় বলে মনে করতেন, তা জগতের প্রাচীন ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। এখানে যে জিৎ রমণীর কথা বলা হল তিনি একজন প্রসিদ্ধ জিৎ বীরের দুহিতা। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর নিজেদের পবিত্র তরবারি দেখতে না পেয়ে তিনি নানাপ্রকার মন্ত্রের সাহায্যে তা' উদ্ধার করেন। এই বিবরণ "হার্বারার শাগ" নামক একখানা আইসলণ্ডীয় ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়।]

গণেশ পূজাঃ হিন্দু সন্তান মাত্রই সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো করে থাকেন। তাঁর পবিত্র নাম আগে স্মরণ না করে কোন রাজপুতই কোনপ্রকার

মঙ্গলানুষ্ঠানে নিয়োজিত হন না। যোদ্ধারা ঐদিনে সিদ্ধিদাতা গণেশের কাছে সুমন্ত্রণা প্রার্থনা করেন। বণিক তাঁর হিসাবের খাতার ওপরে আগে এই নাম লেখেন। রাজস্থানে এমন কোন প্রাসাদ দেখতে পাওয়া যায় না, যার তোরণে গণেশের মূর্তি নেই। ভারতবর্ষের এমন কোন হিন্দুনগর নেই, যার যে কোন একটা তোরণ 'গণেশ পোল' নামে অভিহিত হয়েছে। রাজস্থানের প্রায় প্রত্যেক পবিত্র শৈলকূটে ওঠবার দ্বারপথেই গণেশের এক একটি বিরাট মন্দির আছে।

লক্ষ্মীপূজা: রাজপুতগণ কার্তিকী কোজাগরী পূর্ণিমায় পরম ভক্তি সহকারে সৌভাগ্য-দায়িনী ভগবতী লক্ষ্মীর পূজা করে থাকেন। বাংলাদেশে এই লক্ষ্মীপূজায় যেমন আড়ম্বর দেখতে পাওয়া যায়, রাজপুতনাতেও সেই একই প্রকার আড়ম্বরে এই পূজা পালন করা হয়ে থাকে।

দেওয়ালী: এ পূজার পরবর্তী অমাবস্যার দিনে রাজপুতদের দেওয়ালী অর্থাৎ দীপদানপর্ব। সেইদিন সমগ্র রাজস্থান থেকে জ্বলন্ত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এই দীপদান পর্বে প্রতি নগর, গ্রাম ও সেনানিবেশ আলোকমালায় সাজানো হয়। সেদিন অধিপতি থেকে পর্ণ-কুটির বাসী ভিক্ষাজীবী সকলেই নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী নিজেদের গৃহ দীপাবলীতে সাজাতে ত্রুটি করে না। সেদিন সকলে নৈবেদ্যসহ লক্ষ্মীর মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন। রাণা ঐদিন নিজের প্রধান সচিবের সঙ্গে বসে আহার করেন এবং মন্ত্রী রাণার হাতে রাখা একটা মৃন্ময় দীপবৃক্ষের উপরিভাগে অনর্গল তেল ঢালতে থাকেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া: এরপর শুভ দ্বিতীয়া তিথিতে প্রসিদ্ধ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব পালিত হয়। কথিত আছে তপন-তনয় যমুনা ঐদিনে নিজের ভ্রাতা যমকে নিজের গৃহে এনে ভোজন করিয়েছিলেন। সেইজন্যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পবিত্র ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ করবার পক্ষে প্রশস্ত দিন বলে হিন্দুশাস্ত্রে বলা আছে। আর্যদিগের শাসন গ্রন্থে লেখা আছে যে, যে রমণী এই পবিত্র দিনে নিজের চন্দন তাম্বুলাদি দিয়ে অর্চনা করে ভোজন করিয়ে থাকেন, তিনি কখনও বৈধব্য যন্ত্রণায় পীড়িত হন না। এবং ভ্রাতাও দীর্ঘজীবন লাভ করে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথিতে রাজপুতগণ গোপার্বন উৎসব পালন করে থাকেন। পবিত্র গোধূলি লগ্নে রাজপুতগণ ভক্তি সহকারে তাদের অর্চনা করে থাকেন।

অন্নকূট: ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে রাজস্থানে যতগুলো উৎসব পালিত হয় তার মধ্যে অন্নকূট সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই উৎসব নাথদ্বারে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভারতের নানা দেশ থেকে অসংখ্য বৈষ্ণব ঐ পুণ্যতীর্থে এসে এই মহাপর্বে যোগদান করে থাকেন। রাজস্থানের ভিন্ন ভিন্ন নগরে ভগবান বিষ্ণুর যে সপ্তমূর্তি আছে, এই উৎসব

আরম্ভ মাত্র ঐ সব বিগ্রহ নাথদ্বারে নিয়ে এসে বিবিধ বিধানে পূজা করা হয়। সেই সপ্ত বিগ্রহের পরিতৃপ্তির জন্যে নাথজীদেবের পবিত্র মন্দির প্রাঙ্গণে রাশীকৃত অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করে কূটাকারে রাখা হয়। ভগবানের পূজা শেষ হলে ভক্তগণ সেই স্তূপীকৃত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করেন। রাজপুত জাতির গৌরবকালে এই অন্নকূট মহোৎসব গুরুতর সমারোহের সঙ্গে সম্পাদিত হত। যখন অনর্থ যুদ্ধ-বিগ্রহের অনলস্পর্শে রাজস্থানের অন্তর্দেশ ভস্মে পরিণত হয়নি, যখন বিষ্ণুপরায়ণ রাজপুতগণ নিজেদের অধিপতিগণের উন্নত গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে পরমানন্দে ভক্তি অর্পণ করতে পারতেন, রাজস্থানের সেই সৌভাগ্যের দিনে অন্নকূট পর্বতে প্রবেশ করে নাথদ্বারের পবিত্র তীর্থস্থানে অমূল্য রত্নরাশি প্রদান করতেন।

সুপ্রসিদ্ধ বল্লভাচার্য শ্রীকৃষ্ণের এই সপ্তমূর্তিকে একত্রিত করে মহদীর অন্নকূটোৎসব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সপ্তমূর্তি অনেকদিন যাবৎ এক মন্দিরে রক্ষিত ছিল। পরিশেষে বল্লভের পৌত্র গিরিধারী আপন সপ্ত পুত্রের মধ্যে ভগবানের এই সপ্তরূপকে বিভাগ করে দেন। গিরিধারীর সেই সপ্ত-পুত্রের বংশধরগণ আজো প্রধান পুরোহিতরূপে সেই সপ্ত দেবমূর্তির মন্দিরে অবস্থিত। সেই সপ্তরূপের নাম এবং আধুনিক বাসস্থানের আখ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

	নাথজী	—	নাথদ্বার
১.	নোনীত	—	নাথদ্বার
২.	মথুরানাথ	—	কোটা
৩.	দ্বারকানাথ	—	কঙ্কারাওলি
৪	গোকুল নাথ বা গোকুল চন্দ্রমা	—	জয়পুর
৫.	যদুনাথ	—	সুরাট
৬.	বেতাল নাথ	—	কোটা
৭.	মদনমোহন	—	জয়পুর

ভগবান নাথজী সার্বপ্রধান বলে এই সপ্তরূপের মধ্যে যুক্ত হননি। নোনীত বা ননান্দ দেবের মন্দির নাথজীর সন্নিকটে সংস্থাপিত। এর অপর নাম বাল মুকুন্দ। ইনি বালক মূর্তি। ডান হাতে পেড়া নামে মোদক আছে। প্রাচীন কাল থেকে ইনি গৃহ দেবতার মধ্যে পরিগণিত। যবনেরা শ্রীকৃষ্ণের মন্দির ভেঙ্গে দিলে ভগবান বালমুকুন্দ অনেকদিন ধরে যমুনা সলিলে নিমগ্ন ছিলেন। পরিশেষে একদিন বল্লভাচার্য স্নান করতে গিয়ে তাঁকে পান। বল্লভ সেই দেবমূর্তি নিজের বাড়ীতে এনে গৃহ দেবতার মন্দিরে স্থাপন করে ভক্তি সহকারে পূজা করতে থাকেন। সেইদিন ভগবান বল্লভের কুলদেবতা হয়ে প্রভূত পূজা পেতে লাগলেন। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্তি মথুরানাথের সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

বল্লভাচার্যের তৃতীয় প্রপৌত্র বালকৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় মূর্তি দ্বারকানাথকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কথিত আছে সত্যযুগে অম্বরিক নামে জনৈক নৃপতি সূর্যবংশে অবতীর্ণ হয়ে এক বিষ্ণুমূর্তিকে পূজো করেছিলেন। এই দ্বারকানাথ সেই বিষ্ণুমূর্তির প্রতিরূপ। চতুর্থ মূর্তি গোকুলচন্দ্রমার সম্পর্কে বিচিত্র বিবরণ শুনতে পাওয়া যায়। বলা হয়—বল্লভাচার্য ঐ মূর্তি যমুনা তীরে কোন একটা বিলের মধ্যে পেয়ে নিজের শ্যালককে দান করেন। গোকুলচন্দ্রমা গোপজীবন গোকুলপুরীতে প্রতিষ্ঠিত হন। যদিও এখন তিনি জয়পুরে বিরাজমান। তবুও গোকুলবাসিগণ তাঁর সেই পূর্বের পবিত্র মন্দিরে প্রত্যহ উপস্থিত হয়ে পুজো দিয়ে থাকেন। ভগবানের পঞ্চম মূর্তি যদুনাথ আগে মথুরার সন্নিকটস্থ মহাবণ নামক স্থানে বিরাজ করতেন। দুর্ধর্ষ মহম্মদ গজনান কর্তৃক মথুরাপুরী বিধ্বস্ত হলে তাঁকে সুরাটে নিয়ে আসা হয়।

ষষ্ঠ বিগ্রহ বেতালনাথ বা পান্ডুরঙ্গকে সম্বৎ ১৫৭২ অব্দে বারানসীর গঙ্গা গর্ভে পাওয়া যায়।

সপ্তম মদনমোহনের পুজো একজন রমনী কর্তৃক অতীতে সমাপিত হত।

রাণারা এই অনুকুট উৎসবে নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে কাটান এবং উৎসব পালন করেন।

মকর সংক্রান্তি: কর্ণেল টড ভুলবশতঃ কার্তিকী বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিকে মকর সংক্রান্তি বলে বর্ণনা করেছেন। যাইহোক, কার্তিক মাসের সংক্রান্তি যে একটি পবিত্র দিবস, তা' হিন্দু সন্তান মাত্রেই অবগত। এইদিন রাণা আপনার সর্দার ও সামন্তগণে পরিবৃত হয়ে চোগাঁ প্রাসাদে আসেন। তিনি সর্দার দলের সঙ্গে সেখানে অশ্বারোহণে গোলক ক্রীড়া করেন।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে তেমন বিশেষ কোন ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় না। যদিও তিথি নক্ষত্র সহযোগে এই দুইমাসের মধ্যে দু'চারটে দিন পবিত্র বলে জ্ঞান করা হয়ে থাকে। তথাপি রাজপুতগণ এইদিনগুলোকে পর্বদিবস বলে গণ্য করেন না।

কেবল অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে তাঁদের উৎসব দেখতে পাওয়া যায়। এই তিথি মিত্র সপ্তমী নামে খ্যাত। ভগবান দিবাকর, এই দিবসে ভগবতী অদিতীর গর্ভ থেকে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুতরাং সূর্যবংশীয় রাণা যে এই দিনটিকে পবিত্র বলে জ্ঞান করবেন তা বলাই বাহুল্য। *

* [মহাত্মা টড্ সাহেব ইংরেজ হয়ে রাজপুতদের ধর্ম্ম, পর্ব্ব এবং উৎসব সম্পর্কে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। যদিও স্থানে স্থানে তাঁর ভ্রম দেখতে পাওয়া যায়। তবুও বিচার করে দেখতে গেলে এই ভুল মার্জ্জনীয়। তিনি যদি সংস্কৃত জানতেন তাহলে এ-ধরনের ভুল কখনই তাঁর হত না। এই অধ্যায়ের আগে যে ভানু-সপ্তমীর কথা বলা হয়েছে, সে পর্ব্ব এই মিত্র-সপ্তমীর নামান্তর ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। টড্ সাহেব সেই ভানু-সপ্তমীকে সূর্যের জন্মদিবস বলে নির্দ্দেশ করেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভগবান দিবাকর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা-সপ্তমীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পাঠকগণের বিদিতার্থে "ভবিষ্যপুরাণ" থেকে একটি প্রমাণ বচন উদ্ধৃত করা হল।]

"অদিতেঃ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মিত্রো নাম দিবাকরঃ।
মার্গশীর্ষস্য মাসস্য শুক্লে পক্ষে শুভে তিথৌ।
সপ্তম্যাং তেন সা খ্যাতা লোকেঽস্মিন্ মিত্রসপ্তমী ॥"

রাজপুত স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন, বীরত্ব ও মহত্বের সাধনক্ষেত্র, হিন্দু গৌরবের আদর্শস্থল বীর জননী মেবার ভূমির ধর্ম প্রীতিষ্ঠা ও পর্ব-উৎসবের কথা এখানে কিছু বলা হল।

চিতোরের ইতিহাসে একদিকে যেমন বাপ্পারাওলের বীরত্ব, সমর সিংহের সমর কৌশল, সংগ্রাম সিংহের মহানুভাবুকথা, প্রতাপ সিংহের জলন্ত আত্মত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমিকতা এবং রাজ সিংহের নির্ভিকতা ও তেজস্বিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়, অপরদিকে তাঁদের বংশধরদের বিলাস-প্রিয়তা, ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং অবশেষে গিহেলাট্ কুলের শোচনীয় অধঃপতনও দেখতে পাওয়া যায়। যে গিহেলাট্ রাজবংশের বীরতা, সভ্যতা, তেজস্বিকতা, ও মহানুভবতা একদিন সভ্যজগতে আদর্শস্থানীয় ছিল, যাঁদের বীর্যবহ্নি সুদূর হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে পৌরাণিক শাকদ্বীপের তট পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছিল, যাঁদের একটিমাত্র বংশধরের অলৌকিক বীরত্বে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের প্রচন্ড বল প্রতিহত হয়ে পড়েছিল, সে অলৌকিক বীরত্ব আজ ইতিহাসে পরিণত। বাপ্পারাওল, সমর সিংহ, প্রতাপ সিংহ ও রাজ সিংহের স্তুপীকৃত চিতাভস্ম আর নতুন কোন মহাপুরুষের জন্ম দেবে না। চিতোর আজ নির্বাক। নিরব অতীত ইতিহাসের সাক্ষীমাত্র।

"With the attainment of the freedom of our country on the 15th august 1947 A.D. from the British Rule, which succeeded the mughals, chittore again saw the dawn of freedom with the Liberation of the country from the foreign yoke under the Leadership of Mahatma Gandhi and the dreams of Ranapratap were realised. Rajasthan which was once united the crimson banner of Rana Sangha again integrated itself into the United States of Rajasthan on 30. 3. 49 at the hands of Sardar Patel, one of the builders of India. To commemorate the event freedom of the fort—Rana represented by his prince and Godalia Lohors, both led by Pandit Nehru, the Late Prime minister of India and fallowed by the chief dignitories and representatives of the State of India symbolically entered the partols of this historical fort in a huge procession and unfurled the National Flag, over "The Tower of Victory" on the memorable day of the 6th April, 1955."

॥ চিত্তোর গড়ের দর্শনীয় স্থান ॥

১. ন' লাখ ভাণ্ডার

২. ন' কোঠা

৩. পাটালেশ্বর মন্দির

৪. আলাকাবরার রাজপ্রাসাদ

৫. শ্রীঙ্গার চৌরী

৬. মহারাণা কুম্ভের রাজপ্রাসাদ

৭. নতুন প্রাসাদ

৮. সতী বিশ্বনাথের দেউরী

৯. কুম্ভশ্যাম জী এবং মীরাবাঈ-এর মন্দির

১০. শঙ্কর মহাদেবের মন্দির

১১. জয়স্তম্ভ

১২. মুকুলজীর মন্দির
১৩. গোমুখ
১৪. হাতীকুণ্ড
১৫. জয়মলের রাজপ্রাসাদ
১৬. জয়মল ট্যাংক
১৭. সুরজ কুণ্ড
১৮. মাতাজীর মন্দির
১৯. কালিকা মাতার মন্দির
২০. মাতাজীর ট্যাংক
২১. চুণ্ডার রাজপ্রাসাদ
২২. পদ্মিনীর প্রাসাদ ও জলাশয়
২৩. দৈখানা
২৪. রামপুষো প্রাসাদ
২৫. চিত্রাঙ্গ মৌরীর জলাশয়
২৬. বৈদ্যনাথের মন্দির
২৭. রাজটিলা
২৮. জ্যোতি কুণ্ড
২৯. ভীমলত্
৩০. অদ্ভুতজীর মন্দির
৩১. নীলকান্ত মহাদেবের মন্দির
৩২. নীল নালা
৩৩. কোঠারী বাড়ী
৩৪. শম্ভু কুঞ্জ
৩৫. অন্নপূর্ণার মন্দির
৩৬. মাতাজী কুণ্ড
৩৭. কুক্কুরেশ্বর মন্দির
৩৮. রতন সিংহের রাজপ্রাসাদ
৩৯. রত্নেশ্বর জলাশয়
৪০. কুক্কুরেশ্বর কুন্ড।

চিত্তোরগড় যাঁরা শাসন করেছেন সেইসব মহারাণাদের নাম ও রাজত্বকাল

মহারাণাদের নাম		রাজত্বকাল
১. গেহিলা	—	[কথিত আছে ১৬শ শতাব্দীতে গেহিলা বংশ মেওয়ারে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেন।]
২. ভোগাদিত্য	—	
৩. মহেন্দ্র (নং ১)	—	
৪. নাগাদিত্য	—	
৫. শিলাদিত্য	—	[রাজত্বকাল সুরু ৬৪৬ এ.ডি-তে। খোদিত লিপি অনুসারে]
৬. অপরাজিত	—	[রাজত্বকাল সুরু ৬৬১ এ.ডি-তে। খোদিত লিপি অনুসারে]
৭ মহেন্দ্র (নং ২)	—	
৮. কালাভজা	—	[রাজত্বকাল সুরু ৭৬৩ এ.ডি-তে]
৯. খুমন (নং ১)	—	×
১০. গোবিন্দ	—	×
১১. ভাতৃবং (নং ১)	—	×
১২. আগা সিংহ	—	×
১৩. খুমন (নং ২)	—	×
১৪. মহায়ক	—	×
১৫. খুমন (নং ৩)	—	×
১৬. ভাতৃবং (নং ২)	—	[রাজত্বকাল ৯৪২-৯৪৩ এ.ডি। খোদিত লিপি অনুসারে]
১৭. আল্লাতা	—	[রাজত্বকাল সুরু ৯৫৩ এ.ডিতে। খোদিত লিপি অনুসারে।]
১৮. নরবাহন	—	[রাজত্বকাল সুরু ৯৯১ এ.ডি-তে। খোদিত লিপি অনুসারে]
১৯. শালিবাহন	—	×
২০, শক্তিকুমার	—	[রাজত্বকাল সুরু ৯৭৭ এ.ডি-তে খোদিত লিপি অনুসারে]
২১. অম্বপ্রসাদ	—	×
২২. সুচীবর্মা	—	×

মহারাণাদের নাম		রাজত্বকাল
২৩, নরবর্মা	—	[রাজত্বকাল পাওয়া যায়নি]
২৪. কীর্তিবর্মা	—	×
২৫. যোগোরাজ	—	×
২৬. ভৈরত	—	×
২৭. হাঁসপাল	—	×
২৮. বৈরীসিংহ	—	×
২৯. বিজয়া সিংহ	—	[রাজত্বকাল সুরু ১১৬৭ এ.ডি-তে। খোদিত লিপি অনুসারে]
৩০. অরি সিংহ (নং ১)	—	×
৩১. চোদ্ সিংহ	—	×
৩২. বিক্রমা সিংহ	—	×
৩৩. কর্ণ সিংহ (নং ১)	—	×
৩৪. খসেম সিংহ	—	×
৩৫. সুমন্ত সিংহ	—	[রাজত্বকাল ১১৭২-১১৭৯ এ. ডি। খোদিত লিপি অনুসারে]
৩৬. কুমার সিংহ	—	×
৩৭. মাতান সিংহ	—	×
৩৮. পদ্ম সিংহ	—	×
৩৯. যৈত্র সিংহ	—	[রাজত্বকাল ১২১৩-১২২২, ১২২৮। পুঁথিতে]
৪০. তেজ সিংহ	—	[রাজত্বকাল ১২৫৩-১২৬১, ১২৬৭, এ.ডি। পুঁথিতে]
৪১. সমর সিংহ	—	[রাজত্বকাল ১২৭৩-১৩০২ এ. ডি]
৪২. রত্ন সিংহ	—	[রাজত্বকাল ১৩০২-১৩০৩ এ. ডি]
৪৩. লক্ষণ সিংহ	—	[রাজত্বকাল ১৩০৩ এ. ডি.-তে। হত্যা করা হয়]
৪৪. অরি সিংহ (নং ২)	—	[রাজত্বকাল ১৩০৩ এ. ডি-তে। হত্যা করা হয়]
৪৫. হামীর সিংহ (নং ১)	—	[রাজত্বকাল ১৩২৬-১৩৬৪ এ. ডি]
৪৬. খেত্রী সিংহ	—	[রাজত্বকাল ১৩৬৪-১৩৮২ এ. ডি]
৪৭. লাক্ষা সিংহ	—	[রাজত্বকাল ১৩৮২-১৪১৯-২১ এ. ডি]

মহারাণাদের নাম	রাজত্বকাল
৪৮. মুকুল সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৪১৯-২১-১৪৩৩ এ. ডি]
৪৯. রাণা কুম্ভ	—[রাজত্বকাল ১৪৩৩-১৪৬৮ এ. ডি]
৫০. উদা সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৪৬৮-১৪৭৩ এ. ডি]
৫১. রাইমল	—[রাজত্বকাল ১৪৭৩-১৫০৯ এ. ডি]
৫২. সংগ্রাম সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৫০৯-১৫২৮ এ ডি]
৫৩. রত্ন সিংহ (নং ২)	—[রাজত্বকাল ১৫২৮-১৫৩১ এ. ডি]
৫৪. বিক্রমাদিত্য	—[রাজত্বকাল ১৫৩১-১৫৩৬ এ ডি]
৫৫. বনবীর	—[রাজত্বকাল ১৫৩৬-১৫৩৭ এ. ডি]
৫৬. উদয় সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৫৩৭-১৫৭২ এ. ডি]
৫৭. প্রতাপ সিংহ (নং ১)	—[রাজত্বকাল ১৫৭২-১৫৯৭ এ. ডি]
৫৮. অমর সিংহ (নং ১)	—[রাজত্বকাল ১৫৯৭-১৬২০ এ. ডি]
৫৯. কর্ণ সিংহ (নং ২)	—[রাজত্বকাল ১৬২০-১৬২৮ এ. ডি]
৬০. জগৎ সিংহ (নং ১)	—[রাজত্বকাল ১৬২৮-১৬৫২ এ. ডি]
৬১. রাজসিংহ (নং ১)	—[রাজত্বকাল ১৬৫২-১৬৮০ এ. ডি]
৬২. জয়সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৬৮০-১৬৯৮ এ. ডি]
৬৩. অমর সিংহ (নং ২)	—[রাজত্বকাল ১৬৯৮-১৭১০ এ. ডি]
৬৪. সংগ্রাম সিংহ (নং২)	—[রাজত্বকাল ১৭১০-১৭৩৪ এ. ডি]
৬৫. জগৎ সিংহ (নং ২)	—[রাজত্বকাল ১৭৩৪-১৭৫১ এ. ডি]
৬৬. প্রতাপ সিংহ (নং ২)	—[রাজত্বকাল ১৭৫১-১৭৫৪ এ. ডি]
৬৭. রাজসিংহ (নং ২)	—[রাজত্বকাল ১৭৫৪-১৭৬১ এ. ডি]
৬৮. অরি সিংহ (নং ৩)	—[রাজত্বকাল ১৭৬১-১৭৭৩ এ. ডি]
৬৯. হামীর সিংহ (নং ২)	—[রাজত্বকাল ১৭৭৩-১৭৭৮ এ. ডি]
৭০. ভীম সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৭৭৮-১৮২৮ এ. ডি]
৭১. জোয়ান সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৮২৮-১৮৩৮ এ. ডি]
৭২. সর্দার সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৮৩৮-১৮৪২ এ. ডি]
৭৩. স্বরূপ সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৮৪২-১৮৬১ এ. ডি]
৭৪. শম্ভু সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৮৬১-১৮৭৪ এ. ডি]
৭৫. সজ্জন সিংহ	—[রাজত্বকাল ১৮৭৪-১৮৮৪ এ. ডি]
৭৬. ফেজ সিংহ	—[রাজত্বকাল সুরু ১৮৮৪। পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত।]